কৃষি প্রযুক্তি বার্তা

কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন

কৃষি গবেষণা ও উন্নয়নে টেকসই সহায়তাকারী একটি অ-লাভজনক প্রতিষ্ঠান

www.kgf.org.bd

কৃষি প্রযুক্তি বার্তা

কেজিএফ এর আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান/কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্ভাবিত কৃষি প্রযুক্তি

সময়কাল ২০১৭-২০২০

কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন (কেজিএফ)
টেকসই কৃষি গবেষণা ও উন্নয়নে সহযোগী অ-লাভজনক প্রতিষ্ঠান

কৃষি প্রযুক্তি বার্তা ২০১৭-২০২০

প্রকাশ: ডিসেম্বর ২০২১

ছবি: সংশ্লিষ্ট প্রকল্পসমূহের প্রধান গবেষকদের নিকট হতে সংগৃহিত

সংকলন ও সম্পাদনায়
নাসরিন আক্তার, কেজিএফ
জিএম পানাউল্লাহ, কেজিএফ
জীবন কৃষ্ণ বিশ্বাস, কেজিএফ

প্রকাশনায়
নির্বাহী পরিচালক
কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন (কেজিএফ)
এআইসি বিল্ডিং, চতুর্থ তলা, বিএআরসি কমপ্লেক্স, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।
টেলিফোন: ৮৮০-২-৯১১১০৪১, ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৫৮১৫০২৭০
ই-মেইল: kgf-bd@live.com, ওয়েবসাইট: www.kgf.org.bd

প্রচ্ছদ
তাহসিনা নাজনীন, কেজিএফ

মুদ্রণে
নতুনধারা প্রিন্টিং প্রেস
৩১৪/এ, এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা
ফোন: ০১৭১১-০১৯৬৯১, ০১৯১১-২৯৪৮৫৫

মুখবন্ধ

কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন (কেজিএফ) সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় ২০০৭ সালে প্রতিষ্ঠিত একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি কোম্পানি আইন ১৯৯৪ এর অধীনে নিবন্ধিত। এর কর্মকাণ্ড শুরু হয় ২০০৮ সাল থেকে। সামগ্রিক কৃষি, কৃষি-অর্থনীতি এবং প্রাকৃতিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে গবেষণার জন্য দেশের বিভিন্ন কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে সীমিত পরিমাণ অর্থ সহায়তা করা এ প্রতিষ্ঠানের প্রধান কাজ। প্রয়োজনে উক্ত গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো বেসরকারি কোনো প্রতিষ্ঠান বা উদ্যোক্তদের সাথে যৌথভাবে গবেষণা কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারে। সেক্ষেত্রে গবেষণা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীরাই সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের নেতৃত্ব প্রদান করে থাকে।

কেজিএফ তার শুরু থেকেই স্থান-কাল-পাত্র ভেদে কৃষকের চাহিদাভিত্তিক প্রযুক্তি উদ্ভাবনের বিষয়ে জোর দিয়ে আসছে। এভাবে উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ সম্প্রসারণকর্মীদের মাধ্যমে কৃষকের দোর-গোড়ায় পৌঁছে যাবে বলে কেজিএফ মনে করে। এজন্য প্রযুক্তিসমূহ সবার জন্য বোধগম্য ভাষায় হাত-বই আকারে প্রকাশ করা প্রয়োজন। **কৃষি প্রযুক্তি বার্তা** এমনি একটি প্রয়াশ যা কেজিএফ এর শুরু থেকেই ধারাবাহিক ভাবে চলে আসছে। চলতি সংখ্যায় ২০১৭ থেকে ২০২০ পর্যন্ত পরিচালিত গবেষণা-নির্ভও উদ্ভাবিত বাছাই করা প্রযুক্তিসমূহ থেকে নির্বাচন করা হয়েছে। প্রযুক্তিগুলো কৃষকদের কাজে আসলে গবেষক ও কেজিএফ এর শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো।

পরিশেষে গবেষণা ও প্রকাশনার সাথে সম্পৃক্ত সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি-

জীবন কৃষ্ণ বিশ্বাস
নির্বাহী পরিচালক
কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন

বিষয়-সূচী

		পৃষ্ঠা
১.	**ফসল**	১
১.১	দানা ফসল দ্রুত শুকানোর যন্ত্র	১
১.২	রবি ফসল আবাদে বীজ বপনযন্ত্রের ব্যবহার	২
১.৩	সমন্বিত খামার পদ্ধতির মাধ্যমে হাওর অঞ্চলে কৃষকের খামারের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি	৪
১.৪	বীজবাহিত রোগ দমনের মাধ্যমে আখের ফলন বৃদ্ধি	৬
১.৫	ভোলা জেলার উপকূলীয় ও চরাঞ্চলে নিবিড় চাষাবাদে শস্য বিন্যাসভিত্তিক সমন্বিত পুষ্টি ব্যবস্থাপনা	৮
১.৬	জমিতে বহু ফসল চাষের ক্ষেত্রে মাটির উর্বরতা অক্ষুন্ন রাখার জন্য উন্নত ব্যবস্থাপনা	১০
১.৭	মৌচাষে উপজাত দ্রব্যাদির উৎপাদন বৃদ্ধি ও মানোন্নয়নের জন্য উন্নত প্রযুক্তি	১১
১.৮	সাদা ভুট্টা উৎপাদন প্রযুক্তি ও ব্যবহার	১৩
১.৯	ফল ও সবজির বাজার ব্যবস্থাপনা এবং ভ্যালুচেইন: নিরাপদ খাদ্য ভাবনা	১৬
১.১০	পুষ্টি ব্যবস্থাপনা ও সুরক্ষা কৃষির মাধ্যমে মাটি ও ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি	
১.১১	খাগড়াবিল জলবিভাজিকায় প্রযুক্তি প্রয়োগে অবকাঠামো বাঁধ নির্মাণ ও বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ করে সারা বছর ফসল উৎপাদন কৌশল	
১.১১	পাহাড়ি এলাকায় উন্নত প্রযুক্তিতে জুম চাষ ব্যবস্থাপনা	১৯
১.১২	পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি ভূমিতে জুম চাষের পর মাটিতে থাকা রস দিয়ে বরবটি/ফেলন চাষ	২২
১.১৩	পাহাড়ি জমিতে বছর জুড়ে জুম চাষে নাইট্রোজেন-ফসফরাস-পটাশিয়াম গুটি সারের ব্যবহার	২৩
১.১৪	সার প্রয়োগের মাধ্যমে একই জমিতে প্রতি বছর জুম চাষ	২৫
১.১৫	পাহাড়ি এলাকায় বসতবাড়ির আঙ্গিনায় বছরব্যাপি সবজির চাষ	২৭
১.১৬	পাহাড়ি এলাকায় বারি মাল্টা-১ চাষের আধুনিক কলাকৌশল	৩০
১.১৭	পাহাড়ি এলাকায় গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষের আধুনিক কলাকৌশল	৩৪
১.১৮	পাহাড়ি এলাকায় শিম চাষ	৩৬
১.১৯	পাহাড়ি অ্যাসিড মাটিতে চুন প্রয়োগের মাধ্যমে সবজি চাষ	৩৯
১.২০	পাহাড়ি এলাকায় বারি কলা-৩ চাষের আধুনিক কলাকৌশল	৪১
১.২১	পাহাড়ি এলাকায় লাউ চাষের আধুনিক কলাকৌশল	৪৬
১.২২	পাহাড়ি এলাকায় পানি কচু চাষ	৪৮
১.২৩	পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে আখ চাষ	৫০
২.	**প্রাণিসম্পদ**	
২.১	ব্রয়লার মুরগির জাত বাউ-ব্রো চিকেন	৫০
২.২	বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে কবুতরের রোগ নির্ণয় ও তার চিকিৎসা	৫১
২.৩	গাভীর পুনঃপুন গর্ভধারণ ব্যর্থ হওয়া (রিপিট ব্রীডার সিনড্রোম)	৫৩
২.৪	ক্ষুদ্র ও মাঝারি লেয়ার খামারে জীবনিরাপত্তা পদ্ধতি	৫৬
২.৫	প্রোবায়োটিক দ্বারা পশুখাদ্য হিসাবে ধানের খড়ের পুষ্টিমান বৃদ্ধি	৫৭
২.৬	উপকূলীয় লবনাক্ত জমিতে পশুখাদ্য হিসাবে পাকচোং ঘাস উৎপাদন	৫৮
৩.	**মৎস্য সম্পদ**	
৩.১	বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ছোট ছোট পুকুরে মাছের চাষ	৫৯

কৃষি প্রযুক্তি বার্তা ২০১৭-২০২০

১. ফসল

১.১ দানা ফসল দ্রুত শুকানোর যন্ত্র

বাংলাদেশে উৎপাদিত খাদ্যশস্যের মধ্যে ধান, ভুট্টা এবং গম প্রধান। এই ফসলগুলো কাটার সময়, বিশেষ করে বোরো ও খরিপ-২ মওসুমে দানায় বেশি পরিমাণ পানি (২২-২৭%) থাকে ফলে দানা শুকানো একটি বড় সমস্যা হিসাবে দেখা দেয়। খাদ্যশস্যগুলো এখনও প্রধানত রোদে শুকানো হয়। বৃষ্টি ও খারাপ আবহাওয়ার কারণে বিশেষ করে ধান ও ভূট্টায় ছত্রাক জন্মে এবং দানার গুণগত মানে কমে যায় এবং প্রচুর শস্য নষ্ট হয়।

দুই ধাপে শস্য শুকানোর যন্ত্র

আমাদের দেশে বাণিজ্যিকভাবে ফসল দানা শুকানোর যে যন্ত্র প্রচলিত আছে তা দিয়ে শুধুমাত্র ধান শুকানো যায়। ভূট্টা শুকানোর জন্য কোনো যন্ত্র এখন পর্যন্ত ব্যবহার হতে দেখা যায় না। এই সমস্যা সমাধানে কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে দীর্ঘ প্রায় সাড়ে তিন বছর গবেষণার মাধ্যমে শস্য শুকানোর একটি যন্ত্র তৈরি করেছে হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের খাদ্য প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিভাগ। উদ্ভাবিত যন্ত্রটি "HSTU Multi Crop Dryer" নামে পরিচিত, যা ধানের তুষ পুড়িয়ে ও বিদ্যুতের সাহায্যে চলে।

উদ্ভাবিত প্রযুক্তির বর্ণনা

দুই ধাপে শস্য শুকানো পদ্ধতিকে কাজে লাগিয়ে এ শস্য শুকানোর যন্ত্রটি তৈরি করা হয়েছে। এই যন্ত্রের দু'টি মডেল আছে (দুইটি মডেলে ভাগ করা হয়) যথা মডেল-১ এবং মডেল-২। মডেল-১ এর ক্ষেত্রে, প্রথম ধাপে উচ্চ আর্দ্রতার ধান (সুগন্ধি আতপ/সিদ্ধ, ২৪-৩৪% পানি) অথবা ভুট্টা (২২-২৭% পানি) উচ্চ তাপমাত্রার গরম বাতাসে (১২০-১৬০ ডিগ্রী সে.) ২ হতে ৩ মিনিট শুকানো হয়। এরপর ধান/ভূট্টা দানা ২০ মিনিট টেম্পারিং করার পর ঠাণ্ডা করা হয়। এবার দ্বিতীয় ধাপে ধান/ভূট্টা দানা নিম্ন তাপমাত্রায় (৯০-৬০ ডিগ্রি সে.) ৪-৫ ঘন্টায় শুকানো হয়। অপরদিকে মডেল-২ দিয়ে উচ্চ আর্দ্রতার ধান/ভূট্টা দানা গরম বাতাসে (১২০-১০০ ডিগ্রি সে.) প্রথমে ২-৩ ঘন্টা শুকানো হয়। যখন দানার আর্দ্রতা মধ্যবর্তী মাত্রায় (১৮-১৯% পানি) পৌঁছে ঠিক তখন ঐ একই ড্রায়ারে নিম্ন তাপমাত্রায় (৮০-৬০ ডিগ্র সে.) শুকানো হয়। উভয় ক্ষেত্রে ধান বা ভূট্টার দানায় পানির পরিমাণ নিরাপদ মাত্রায় চলে (১২-১৪%) আসে মাত্র ৫-৬ ঘন্টায় ও দানার গুণগত মান বজায় রেখে দীর্ঘকাল সংরক্ষণ করা যায়।

শস্য শুকানো শেষে সংরক্ষণের জন্য বস্তাবন্দী

কৃষক পর্যায়ে এই প্রযুক্তির প্রয়োগ

দুই ধাপে শস্য শুকানোর যন্ত্রটি কৃষকদের জন্য একটি অত্যাবশ্যক প্রযুক্তি। যন্ত্রটির মডেল-১ অথবা মডেল-২ এলাকাভিত্তিক (যেখানে ধান,ভুট্টা, গম, ইত্যাদি খাদ্যশস্য জন্মে) স্থাপনের ব্যবস্থা করা যায়। তাতে একদিকে যেমন ঐ এলাকার কৃষকদের উচ্চ আর্দ্রতার শস্য শুকানোর সমস্যাটির সমাধান করা সম্ভব হবে তেমনি অনেক মানুষের

কর্মসংস্থানের সুযোগও সৃষ্টি হবে। এছাড়া, খাদ্য বিভাগের LSD ও CSD গোডাউনে এই যন্ত্র বসিয়ে কৃষকদের সহায়তা করা যেতে পারে।

এই প্রযুক্তি ব্যবহারের খরচ ও লাভের পরিমাণ

ফসল শুকানোর যন্ত্রটির মডেল-১ প্রতিদিন ২১-২৮ টন ধান/ভুট্টা শুকানোর ক্ষমতা সম্পন্ন। এটি স্থাপনের জন্য স্থানভেদে খরচ পড়বে ৪০-৪৫ লক্ষ টাকা এবং মডেল-২ (ক্ষমতা প্রতিদিন ১৪-২১ টন) স্থাপনের জন্য স্থানভেদে খরচ পড়বে ২০-২৫ লক্ষ টাকা। মডেল-১ ব্যবহার করে শস্য শুকাতে খরচ হবে আদ্রর্তাভেদে প্রতি কেজি মাত্র ৪০ হতে ৬০ পয়সা এবং মডেল-২ দিয়ে শস্য শুকাতে খরচ পড়বে আদ্রর্তাভেদে কেজি প্রতি মাত্র ৫০ হতে ৭০ পয়সা, যা প্রচলিত রোদে শুকানোর খরচ (কেজি প্রতি ৮০ পয়সা হতে ১ টাকা) হতে অনেক কম। এই যন্ত্র দিয়ে বাণিজ্যিকভাবে শস্য শুকানো হলে উদ্যোক্তা প্রতিদিন কমপক্ষে ২০-৩০ হাজার টাকা লাভ করতে পারবেন।

প্রধান গবেষক: প্রফেসর ড. মোঃ সাজ্জাদ হোসেন সরকার, --------------------ইঞ্জিনিয়ারিং, হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর, ই-মেইল: mssarker_hstu@gmail.com, মোবাইল: ০১৭১৩-১৬৩৩৪৭, ০১৭০৫-৯৫০০০৩

১.২ রবি ফসল আবাদে বীজ বপনযন্ত্রের ব্যবহার

বারি বীজ বপনযন্ত্র

বাংলাদেশে রোপা আমন ধান কাটার পর রবি ফসল আবাদের জন্য সাধারণত ৩-৪ টি চাষ ও মই দিয়ে জমি তৈরি করে এবং বীজ হাতে ছিটিয়ে বোনা হয় যাতে অনেক সময় লাগে এবং মজুরি খরচও বেশি হয়। এই পুরানো পদ্ধতিতে রবি ফসল বুনতে বেশ দেরি হয়ে যায়, যে কারণে সাধারণত ফলন আশানুয়ায়ী হয় না। উপরন্তু দেশে আজকাল কৃষি শ্রমিকের অভাব দেখা দিয়েছে। বিগত ২০০৩-০৪ সালে বাংলাদেশে কৃষিতে শ্রমিকের প্রাপ্যতা ছিল ৫১.৭% যা ২০১৮-১৯ সালে কমে ৪০.২% এ নেমেছে। এসব কারণে কৃষিতে যন্ত্রের ব্যবহার এখন সময়ের দাবি। তাই, কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর লক্ষ্য সামনে রেখে এবং বাংলাদেশের কৃষকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)-এর কৃষি যন্ত্রপাতি ও শস্য সংগ্রহোত্তর প্রক্রিয়াজাতকরণ বিভাগ কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে বিভিন্ন ফসলের উপযোগী বীজ বপনযন্ত্র উদ্ভাবন করেছে। বাংলাদেশের সব অঞ্চলের গ্রামেগঞ্জেও পাওয়ার টিলার (১২ বা ১৬ অশ্বশক্তির) পাওয়া যায়, তাই বারি উদ্ভাবিত বীজ বপন যন্ত্রটি পাওয়ার টিলারের সাহায্যে চালনার উপযোগী করে তৈরি করা হয়েছে। এতে যেমন পাওয়ার টিলারের বহুমুখী ব্যবহার বাড়বে তেমনি কৃষকগণ অল্প খরচে রবি ফসলের জন্য দ্রুত জমি তৈরি ও বীজ বপন করতে পারবেন। যথাসময়ে বুনতে পারার কারণে রবি ফসলের ফলনও বাড়বে। বারি বীজ বপনযন্ত্রের সাহায্যে জমিতে একটি বা দু'টি চাষ দেয়া, সারিতে বীজ বোনা ও বীজ ঢেকে দেয়া, এ তিনটি কাজ এক সঙ্গে করে ফেলা যায়। সারিতে বীজ বোনার ফলে বীজ কম লাগে, বীজ বাবদ খরচ কম হয়, সহজে আগাছা

বীজ বপনযন্ত্রের বীজাধার

পরিষ্কার করা যায়, গাছ বেশি আলো বাতাস পায় তাই ফলন বাড়ে। মাঠ পর্যায়ে বীজ বপনযন্ত্রের ব্যবহার আশানুরূপ না হওয়ায় ২০১৫ সালে দেশের মাত্র ৩% জমিতে যন্ত্রের সাহায্যে বীজ বোনা হয়, তবে ২০২১ সাল নাগাদ দেশে যান্ত্রিক বীজ বপনের হার ২৫% এ উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া, কৃষি যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে স্বল্পচাষে ফসল উৎপাদন ও জমির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য যন্ত্রের সাহায্যে বিনা চাষে বা স্বল্প চাষে ফসল আবাদ পদ্ধতির প্রসারের পরিকল্পনা করা হয়েছে।

উদ্ভাবিত প্রযুক্তির বর্ণনা ও ব্যবহার বিধি

বারি বীজ বপনযন্ত্র দিয়ে জমিতে নিবিড় চাষ যেমন করা যায় তেমনি যন্ত্রাংশ বদল করে স্ট্রিপ বা ফালি চাষ করা যায় বা বিনা চাষে আবাদ করা যায়।

বীজ বপনযন্ত্রের সাহায্যে সারিতে বোনা রবি ফসলের মাঠ

পাওয়ার টিলারের রোটাভেটর খুলে বীজ বপনযন্ত্রটি পাওয়ার টিলারের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হয়। ফসল অনুযায়ী সারি থেকে সারির দূরত্ব ও গভীরতা ঠিক করে জমির এক প্রান্তে পাওয়ার টিলার নিয়ে বীজ বপনযন্ত্রে পরিমাণ মত বীজ ঢালতে হয়। পাওয়ার টিলারের গিয়ার ২ নম্বরে রেখে (গতি ২ থেকে ২.৫ কিমি/ঘন্টা) যন্ত্রটি চালাতে হয়। কাজ করার সময় মইয়ের চাকার (লাগ হুইলের) খাঁজ অনুসারে হাঁটতে হবে। প্লাস্টিক টিউবের মধ্য দিয়ে সারিতে ঠিকমতো বীজ পড়ছে কিনা তা লক্ষ্য করতে হবে। জমির শেষ প্রান্তে পৌঁছানোর প্রায় ৮ ফুট (২.৪ মিটার) আগেই বীজ বপন বন্ধ করে দিয়ে টিলারটি ঘোরাতে হবে। এই যন্ত্র এক সঙ্গে ৬ সারিতে গম ও পাট, ৪ সারিতে মুগ ডাল, মসুর, বাদাম ও সরিষা এবং ২ সারিতে ভুট্টা বপন করতে পারে, তবে প্রয়োজন অনুসারে ফসল অনুযায়ী সারি থেকে সারির দূরত্ব এবং বীজ বপনের গভীরতা কম বেশি করার ব্যবস্থা আছে। বিভিন্ন ধরণের বীজের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ধরণের বীজ প্লেট ব্যবহার করতে হবে।

বারি বীজ বপনযন্ত্র ব্যবহারের সুবিধা

- মাটির আর্দ্রতাকে কাজে লাগিয়ে বীজ বপন ও চারার প্রাথমিক বৃদ্ধি নিশ্চিত করা যায়
- দুই ফসলের মধ্যবর্তী সময় কমানো যায় (৭-১০ দিন)
- বীজ উত্তমভাবে মাটির সংস্পর্শে আসে বিধায় সমানভাবে গজায়
- জ্বালানী খরচ কমে শতকরা ৩০-৫০ ভাগ
- বীজ বোনার খরচ শতকরা প্রায় ৩৫-৫০ ভাগ কমে ফসল অনুযায়ী বীজ হার নিয়ন্ত্রণ করা যায়
- কম চাষে, কম সময়ে বীজ বপনের ফলে ডিজেল কম পুড়ে ও বায়ুদূষণ কম হয়
- ছোট জমিতেও ব্যবহার করা যায়
- প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ সহজলভ্য
- স্থানীয় ওয়ার্কশপে খুচরা যন্ত্রাংশ তৈরি করা যায়।
- কৃষক তাঁর নিজের জমিতে ব্যবহার করতে পারেন এবং অন্যের জমিতে চাষের জন্য ভাড়া দিয়ে বাড়তি আয় করতে পারেন।

এই প্রযুক্তি ব্যবহারে খরচ ও লাভের পরিমাণ

বারি বীজ বপনযন্ত্রের দাম ৬৫,০০০ টাকা, পাওয়ার টিলারের দাম ১,৩৫,০০০ টাকা, এই হিসাবে যন্ত্র ক্রয়ে ১,৯০,০০০ টাকা প্রয়োজন। জ্বালানী, চালক, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ, ইত্যাদি বাবদ খরচ মিলিয়ে বারি বীজ বপনযন্ত্র ব্যবহারের খরচ ঘন্টায় ২৬৪ টাকা। যন্ত্র চালনার জন্য হেক্টরপ্রতি খরচ ২,৪০০ টাকা অর্থাৎ বিঘাপ্রতি খরচ ৩২০

টাকা। অন্যদিকে, প্রচলিত পদ্ধতিতে তিন চাষ, মই প্রদান, লাইন তৈরি, লাইনে বীজ বপন ও ঢেকে দেওয়ার জন্য হেক্টরে ১৫,৭৫০ টাকা অর্থাৎ বিঘাপ্রতি ২,১০০ টাকা প্রয়োজন হয়। তাই, প্রচলিত পদ্ধতির বিপরীতে যন্ত্র দ্বারা বীজ বপন কৃষকের জন্য অনেক বেশী লাভজনক।

কোন কৃষক যদি বারি বীজ বপনযন্ত্রটি ক্রয় করে ব্যবসা হিসেবে ব্যবহার করেন, তাহলে হেক্টরপ্রতি সহজেই ৭,৫০০ টাকা উপার্জন করতে পারবেন। এই যন্ত্রের ব্যবসায়িক ব্যবহারে লাভ-খরচের অনুপাত ২.১২। সঠিকভাবে ব্যবহারে যন্ত্রটি দ্বারা বছরে ১,৮০,০০০ টাকা লাভ করা সম্ভব। সঠিকভাবে পরিপূর্ণ ব্যবহারে বারি বীজ বপনযন্ত্রটি মাত্র ৪৩ দিনেই ব্যবহার করে বিনিয়োগ উঠিয়ে আনতে পারে ।

প্রধান গবেষক: ড. মোঃ আইয়ুব হোসেন, ফার্ম মেশিনারী এন্ড পোষ্ট হারভেস্ট বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর, ই-মেইল: ayub.fmpe@bari.gov.bd, mahossain.fmpe@gmail.com, মোবাইল: ০১৭১৬-৯৭৯০৩৪

১.৩ সমন্বিত খামার পদ্ধতির মাধ্যমে হাওর অঞ্চলে কৃষকের খামারের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি

শুকনা মৌসুমে হাওর এলাকায় কৃষকের বসতভিটা

বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সুনামগঞ্জ, বৃহত্তর কিশোরগঞ্জ (পূর্বাংশ), সিলেট ও মৌলভীবাজার (অংশবিশেষ), হবিগঞ্জ জেলার বৃহদংশ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং নেত্রকোণা জেলার প্রায় ৫৭ টি উপজেলায় ছোট বড় প্রায় ৩৭৩টি হাওর আছে যেখানে প্রায় ২ কোটি লোকের বসবাস। হাওর এলাকাগুলো প্রতি বছরই মৌসুমী বর্ষায় ও হঠাৎ বন্যায় ৫-১০ মিটার পর্যন্ত গভীর পানিতে তলিয়ে থাকে। বছরের মে থেকে অক্টোবর (কখনো নভেম্বর পর্যন্ত স্থায়ী হয়, প্রায় ৬-৭ মাস) পর্যন্ত হাওর অঞ্চলে চারিদিকে থৈ থৈ পানি থাকে। এখানে সাধারণত একমাত্র রবি মৌসুমেই ফসলের চাষ হয়, বোরো ধান, আলু, মিষ্টি আলু, ডাল, বাদাম, সরিষা ইত্যাদি ফসলের চাষাবাদ করা হয়। এ সময় নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন আগাম হঠাৎ বন্যা, শিলাবৃষ্টি, পোকার আক্রমণে ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। দেশে মিঠা পানির মাছের প্রধান উৎস এই হাওর অঞ্চল। এক দিকে বোরো ধান ও অন্য দিকে মিঠা পানির মাছ উৎপাদনের অন্যতম প্রধান এলাকা হওয়ায় এই হাওর অঞ্চল দেশের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক অঞ্চল। তথাপি এই অঞ্চলে এখন পর্যন্ত আশানুরূপ উন্নয়ন ঘটেনি। এখনও হাওর এলাকার কৃষক জনগোষ্ঠির ৩০% দরিদ্র ও ৪০% অতি দরিদ্র। একক ফসল বোরো ধানের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় নদীভাঙন, হঠাৎ বন্যা, খরা, টাকাপয়সার অভাব কৃষকের খাদ্য নিরাপত্তার প্রতি হুমকি স্বরূপ। ফলশ্রুতিতে কৃষকের দুর্বলতা, অসুস্থতা ও কাজের অক্ষমতা কৃষির উৎপাদনশীলতা কমিয়ে দিচ্ছে। এমতাবস্থায়, হাওর অঞ্চলে কৃষি ও কৃষকের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে 'সমন্বিত খামার ব্যবস্থা গবেষণার মাধ্যমে হাওর অঞ্চলে কৃষকের খামারের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি' প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়।

প্রকল্পে প্রধানত নিম্নলিখিত বিষয়ে জোর দেওয়া হয়:

১. কৃষকের অংশগ্রহণের মাধ্যমে হাওরের জন্য উপযুক্ত প্রযুক্তি উদ্ভাবনের কাজ;
২. সমন্বিত ফসল উৎপাদন, শাক-সবজি চাষ, পশুপালন, মাছ শিকার এবং কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ইত্যাদির মাধ্যমে কৃষকের খামারের উৎপাদন ও কৃষক পরিবারের আয় বাড়ানো;
৩. কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও বাজার সংযোগ উন্নয়ন;
৪. নিজস্ব কৃষি সম্পদের ব্যবহার ও উন্নয়নে কৃষক প্রশিক্ষণ।

প্রকল্পের মাধ্যমে উদ্ভাবিত/নির্বাচিত প্রযুক্তির বর্ণনা

আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে উদ্ভাবিত/নির্বাচিত ২৩টি প্রযুক্তির মধ্যে প্রধান ১০টি প্রযুক্তি:

- সুনামগঞ্জের হাওর অঞ্চলে বোরো ধানের আগে সরিষার চাষ
- হাওর অঞ্চলে ফুলকপির উৎপাদন প্রযুক্তি
- হাওরে স্কোয়াশ উৎপাদন প্রযুক্তি
- হাওর অঞ্চলে উন্নত পদ্ধতিতে মুরগির বাচ্চা পালন
- হাওর অঞ্চলে কবুতর পালন করে কৃষকের আয় বৃদ্ধি
- জৈব নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও নিয়মিত টিকা প্রদান করে গবাদি ও হাঁস-মুরগির স্বাস্থ্য উন্নয়ন
- ভেড়া ও তার বাচ্চার প্রতিপালন
- হাওরে ভাসমান খাঁচায় প্রোবায়োটিক যুক্ত খাবারে মনোসেক্স তেলাপিয়া উৎপাদন কৌশল
- হাওর অঞ্চলে মৌসুমি পুকুরে দ্রুত বর্ধনশীল মাছের মিশ্র চাষ কলাকৌশল
- হাওর অঞ্চলে বাৎসরিক পুকুরে রুই জাতীয় ও ছোট মাছের মিশ্র চাষ কলাকৌশল

সমন্বিত খামার পদ্ধতির অধীনে বসতভিটায় বছরজুড়ে সবজি চাষ

প্রযুক্তি ব্যবহারে খরচ ও লাভের পরিমাণ

প্রকল্পকালিন উদ্ভাবিত/নির্বাচিত ২৩টি প্রযুক্তির মধ্যে ১০ প্রযুক্তির বার্তায় আলাদাভাবে খরচ ও লাভের হিসাব প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া প্রকল্প এলাকায় ২৫ টি পরিবার নিয়ে সমন্বিত খামার ব্যবস্থা গবেষণা পরিচালনা করা হয়। চার বছর গবেষণা করার পর সারা বছরে গড় প্রতি পরিবারের আয় ও ব্যয়ের একটি হিসাব করা হয় যাহা নিম্নে প্রদান করা হল।

আয় ও ব্যয়ের খাত	প্রতি খামারের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের অবস্থা	
	গবেষণার পূর্বে	গবেষণার পরে
বাৎসরিক উৎপাদন খরচ (টাকা)	৭২৩১৭	৫৮৫৩৬.৬
বাৎসরিক মোট আয় (টাকা)	১৪৫০৪৮.৫	৩২৮১১৪.৪
বাৎসরিক নিট আয় (টাকা)	৫০৮৫৪.২৮	২৬৯৫৭৭.৫

প্রধান গবেষক: প্রফেসর ড. মোঃ আবুল কাসেম, কৃষি অনুষদ, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ই-মেইল: neem98k@yahoo.com, মোবাইল: ০১৭১২-২১৩৭০৭

১.৪ বীজবাহিত রোগ দমনের মাধ্যমে আখের ফলন বৃদ্ধি

বাংলাদেশে আখের গড় ফলন প্রতি হেক্টরে মাত্র ৪৬.১ টন, যা সারা পৃথিবীর গড় ফলনের (৬৫.২ টন/হেক্টর) চেয়ে অনেক কম এবং আখ থেকে চিনি আহরণের গড় হার মাত্র ৭.০% অথচ অন্যান্য আখ উৎপাদনকারী দেশে চিনি আহরণের হার গড়ে ১০.০%। দেশে আখের এই ব্যপক ফলন হ্রাসের জন্য রোগবালাইয়ের আক্রমণ প্রধানত দায়ী। বাংলাদেশে আখের প্রধান প্রধান রোগগুলো হল: লাল পচা, স্মাট, উইল্ট, রেটুন স্টান্টিং, সাদা পাতা ও বীজ পচা। এর প্রায় সবগুলোই বীজবাহিত রোগ যা ঘটে থাকে রোগমুক্ত বীজ ব্যবহার না করার জন্য, রোগ দমনের ব্যবস্থা গ্রহণ না করা ও সঠিক পরিচর্যা না করার কারণে। দেশে প্রতি বছর রোগবালাইয়ের কারণে ইক্ষুর ফলন গড়ে ২০% হ্রাস পায়, অনেক সময় শুধু মাত্র লাল পচা রোগের কারণে আখের ফলন শতভাগ হ্রাস পেতে পারে। বিশেষ করে মুড়ি আখে রোগের প্রাদুর্ভাবে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। দেশে চিনি ও গুড়ের চাহিদা বছরে প্রায় ২০ লক্ষ টন অথচ উৎপাদিত হয় মাত্র ৪-৫ লক্ষ টন, বাকী চিনি বিদেশ থেকে আমদানী করতে হয়। দেশে প্রায় ১.১২ লক্ষ হেক্টর জমিতে আখ চাষ হয়, হেক্টর প্রতি ফলন বৃদ্ধি ও চাষাবাদের পরিমাণ বৃদ্ধি করা ছাড়া এই চাহিদা মিটানো সম্ভব নয়। রোগমুক্ত বীজ ব্যবহার, উন্নত চাষাবাদ ও মুড়ি আখের চাষ বৃদ্ধির মাধ্যমে আখের ফলন বৃদ্ধি ও কৃষকের আয় বৃদ্ধি করা সম্ভব। বাংলাদেশ সুগারক্রপস গবেষণা ইনস্টিটিউট ও কৃষিবিদ সমবায় সোসাইটি লি: ২০১৫ থেকে ২০১৮ এই তিন বছর কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে বাংলাদেশ সুগারক্রপস গবেষণা ইনস্টিটিউটের নিজস্ব খামার, চাপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপজেলা, নড়াইল জেলার কালিয়া উপজেলা, মানিকগঞ্জ জেলার সিংগাইর উপজেলা ও সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলায় কৃষকের মাঠে ইক্ষু জাত ঈশ্বরদী ৩৭ ও বিএসআরআই আখ ৪১ সহকারে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ইক্ষুর প্রধান প্রধান রোগ দমনের মাধ্যমে ইহার উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির উন্নত কৌশল উদ্ভাবন করে।

উদ্ভাবিত প্রযুক্তির বিবরণ

- ইক্ষুর বীজবাহিত রোগ দমনের জন্য ৫৪° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা ও ৯৫% আর্দ্রতার গরম বাতাসে ইক্ষু বীজ ৪ ঘন্টাকাল শোধন পদ্ধতি অত্যন্ত কার্যকর।
- প্রথম বছর ইক্ষু বীজ খণ্ড (এক চোখ বিশিষ্ট) ৫৪° সে:গ্রে: তাপমাত্রা ও ৯৫% আর্দ্রতার গরম বাতাসে ৪ ঘন্টা কাল শোধন ও পরে ছত্রাক নিরোধী কার্বেন্ডাজিম ৫০ ডাবলিউপি-র ০.২% দ্রবণে ৩০ মিনিট কাল শোধন করে পলিব্যাগে চারা উৎপাদন ও পরবর্তীতে মূল জমিতে ১ মিটার দূরত্ব বজায় রেখে কোদাল দিয়ে ৯ ইঞ্চি গভীর করে নালা কেটে নালায় ১ ফুট পর পর চারা রোপণ করতে হবে। দ্বিতীয় বছর ঐ জমি থেকে বীজ নিয়ে শুধুমাত্র কার্বেন্ডাজিম ৫০ ডাবলিউপি-ও ০.২% দ্রবণে ইক্ষুবীজ ৩০ মিনিট কাল শোধন করে নিতে হবে এবং ১ম বছরের মুড়ি রেখে দিতে হবে। তৃতীয় বছর ২য় বছরের জমি থেকে বীজ নিয়ে একইভাবে স্থাপন করতে হবে ও পূর্ববর্তী বছরের মুড়ি আখ কর্তন করে ২য় মুড়ি রাখতে হবে।
- জমিতে সার ও সেচ প্রয়োগ, আগাছা পরিষ্কার ও পোকামকড় দমন ও অন্যান্য সাধারণ পরিচর্যার কাজ সুপারিশকৃত পদ্ধতিতে করাতে হবে। দ্বিতীয় বার উপরি সার প্রয়োগের পর আখের গোড়ায় বেশী করে মাটি তুলে দিতে হবে যাতে আখ গাছ বাতাসে হেলে পড়তে না পারে। প্রয়োজনে একাধিক বার গোড়ায় মাটি দিতে হবে। এছাড়া আখের গোড়ার মড়া পাতা ছাড়িয়ে পরিষ্কার করতে হবে যাতে পর্যাপ্ত আলো বাতাস প্রবেশ করতে পারে ও পোকা মাকড়ের আবাসস্থল নষ্ট হয়।
- আখের বয়স ৩ মাস হওয়ার পর থেকে প্রতি মাসে একবার করে আখের রোগের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। রোগাক্রান্ত আখ গাছ শিকড়সহ তুলে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

- প্রথম বছরের আখ কাটার পর ২য় বছর উহার মুড়ি রাখতে হবে এবং ৩য় বছরে মুড়ি আখ কর্তন করে ২য় মুড়ি রাখতে হবে। মুড়ি আখ রাখতে হলে নভেম্বর মাসের মধ্যেই আখ কর্তন করতে হবে, কারণ তখন তাপমাত্রা ২৫-২৬° সে:গ্রে: এর মত থাকে যা আখের অঙ্কুরোদ্গমের এর জন্য সহায়ক। মুড়ি রাখার জন্য আখ কেটে গোড়া ভালভাবে কোদাল দ্বারা মুণ্ডন করে সমান করতে হয়। মরা পাতা ও ধ্বংসাবশেষ ভালভাবে পুড়িয়ে রোগজীবাণু ও পোকামাকড় ধ্বংস করতে হবে। এরপর আখের সারির দুই দিকে কোদাল দিয়ে অথবা লাঙ্গল দিয়ে মাটি আলগা করতে হবে এবং সার ও সেচ দিতে হবে। মুড়ি আখের ক্ষেত্রে সার দুইবারে প্রয়োগ করতে হয়, ১ম বার আখের গোড়া আলগা করার সময় আর ২য় বার আখের রয়স ৩-৪ মাস হওয়ার পর। মুড়ি আখের ক্ষেত্রে অবশ্য ২৫% হারে অতিরিক্ত ইউরিয়া সার প্রয়োগ করতে হয় কারণ মুড়ি আখে নুতন আখের চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণ কুশি হয়। অন্যান্য পরিচর্যা চারা রোপণকৃত আখের মতই করতে হবে। অনেক সময় আখ গাছ বেশি লম্বা হয়ে গেলে তা যাতে বাতাসে হেলে না পড়ে তার জন্য পাশাপাশি দুই সারির ৪ ঝাড় করে আখ বেঁধে দিতে হবে। জমিতে যাতে পানি জমে না থাকতে পারে সেজন্য নালা কেটে পানি বের করে দিতে হবে কারণ, আখের জমিতে পানি জমে খাকলে লাল পচা রোগের আক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

এই প্রযুক্তি ব্যবহারের সুফল

- প্রথম, ২য় ও ৩য় প্রজন্মের রোপণ করা আখে ও ১ম ও ২য় মুড়ি আখে ৫-৩১% স্মাট রোগ এবং ০.৫৯- ১.৬৮% লাল পচা রোগ দেখা যায়।
- তাপশোধিত বীজ হতে উৎপাদিত আখে হেক্টরপ্রতি ৮৯০০০-১১২০০০ মাড়াইযোগ্য আখ উৎপাদিত হয়, যেখানে অপরিশোধিত বীজ হতে ৬৭০০০-৮৮০০০ মাড়াইযোগ্য আখ উৎপাদিত হয়, অর্থাৎ অপরিশোধিত বীজের তুলনায় শোধিত বীজ হতে উৎপাদিত মাড়াইযোগ্য আখের পরিমাণ ১৮-৩৩% বেশি হয়। তাপশোধনকৃত বীজ হতে ১ম, ২য় ও ৩য় প্রজন্মের রোপণ করা আখের জমিতে হেক্টরপ্রতি ১২৯-১৩৯ টন আখ উৎপাদিত হয়, অপরদিকে অশোধিত বীজ হতে উৎপাদিত আখের প্লটে হেক্টরপ্রতি ৯৯-১০০ টন আখ উৎপাদিত হয়, অর্থাৎ শোধিত বীজ অশোধিত বীজের তুলনায় ২৮-৩৯% অধিক আখ উৎপাদন করতে পারে। শোধিত বীজের মুড়ি আখের জমিতে হেক্টরপ্রতি ৯০-১০৫ টন আখ উৎপাদিত হয়, অপরদিকে অশোধিত বীজের মুড়ি আখের জমিতে হেক্টরপ্রতি ৬০-৭৪ টন আখ উৎপাদিত হয়, অর্থাৎ অশোধিত বীজের তুলনায় তাপ-শোধিত বীজের মুড়ি আখে ৪২-৪৮% বেশি ফলন হতে পারে।
- তাপ-শোধিত বীজ হতে উৎপাদিত আখে অশোধিত বীজের আখের তুলনায় ৭-৮% বেশি ব্রিক্স পাওয়া যায়, অর্থাৎ অধিক চিনি পাওয়া যায়।

এই প্রযুক্তি ব্যবহারে খরচ ও লাভের পরিমাণ

আখ চাষিগণ ইক্ষুবীজ বীজ ৫৪° সে:গ্রে: তাপমাত্রা ও ৯৫% আর্দ্রতার গরম বাতাসে ৪ ঘন্টা কাল শোধন করে ও পরে ছত্রাকনিরোধী কার্বেন্ডাজিম ৫০ ডাবলিউপি-এর ০.২% দ্রবণে ৩০ মিনিট কাল শোধন করে অথবা তাপ-শোধিত বীজের বংশজাত আখের বীজ ব্যবহার করে আখ চাষ করলে আখচাষীগণ আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারবেন, বিশেষ করে চিবিয়ে খাওয়া আখ চাষ করে হেক্টরপ্রতি প্রায় ৭-৮ লক্ষ টাকা আয় করতে পারবেন যা অন্য কোন ফসল আবাদ করে সম্ভব নয়। এতে আখ চাষিগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি হবে। তাপ-শোধিত মানসম্পন্ন বীজ ব্যবহার করলে আখের রোগবালাই কমে যাবে এবং দেশে আখের ফলন উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাবে, ফলে চিনির আমদানি কম হবে ও বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হবে।

প্রধান গবেষক: ড. মোঃ সামসুর রহমান, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্ত, বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদী, পাবনা, ই-মেইল: msrahmanbsri@gmail.com, মোবাইল: ০১৭১৬-১৬৫৬৬৯

১.৫ ভোলা জেলার উপকূলীয় ও চরাঞ্চলে নিবিড় চাষাবাদে শস্য বিন্যাসভিত্তিক সমন্বিত পুষ্টি ব্যবস্থাপনা

মাঠ থেকে মৃত্তিকা নমুনা সংগ্রহ

বর্তমানে বাংলাদেশ দানাজাতীয় খাদ্যশস্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। উচ্চ ফলনশীল জাতের ব্যবহার এবং ফসলের নিবিড়তা বাড়ানোর ফলে এটা সম্ভব হয়েছে। পক্ষান্তরে, একই জমিতে বছরে একাধিক ফসল উৎপাদনের ফলে মৃত্তিকা উর্বরতা ও উৎপাদনশীলতা হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে। প্রতি বছর একই জমিতে উৎপাদিত বিভিন্ন ফসল যে পরিমাণ পুষ্টি উপাদান মাটি থেকে শোষণ করছে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই তার সমপরিমাণ পুষ্টি উপাদান মাটিতে যোগ করা হচ্ছে না, আর যে পরিমাণ যোগ করা হচ্ছে তার প্রায় পুরোটাই রাসায়নিক সার হিসাবে প্রয়োগ করা করা হচ্ছে। এর ফলে মাটির প্রাণ অর্থাৎ জৈব পদার্থের পরিমাণ দিন দিন কমে যাচ্ছে। এমনিতেই আমাদের দেশের উচ্চ তাপমাত্রা ও অধিক আর্দ্রতার কারণে মাটিতে বিদ্যমান জৈব পদার্থ দ্রুত জারিত হয়ে পরিমাণে কমে যাচ্ছে, অপরদিকে সেই হারে জৈব পদার্থ মাটিতে যোগ হচ্ছে না। জমিতে এখন গোবর, ইত্যাদি জৈব সার যোগ করা সম্ভব হচ্ছে না। এমতাবস্থায়, জমিতে জৈব পদার্থ যোগ করার একটি সহজ উপায় হলো ফসল কাটার সময় বা মাড়াইয়ের পর গাছের অবশিষ্টাংশ মাটিতে মিশিয়ে দেয়া। আবার, বাংলাদেশের সিংহভাগ কৃষক তাঁদের পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে অনুমানভিত্তিক সারের মাত্রা ব্যবহার করে থাকেন, কোনো সার প্রয়োজনের তুলনায় কম ব্যবহার করেন আবার অনেক সময় কোনো সার প্রয়োজনের তুলনায় বেশি ব্যবহার করে থাকেন। এতে মটিতে গাছের পুষ্টি উপাদানগুলোর মধ্যে ভারসাম্য নষ্ট হয়ে জমির উৎপাদনশীলতা কমে যাচ্ছে। কোন ফসল কি পরিমাণ পুষ্টি উপাদান মাটি থেকে গ্রহণ করছে এ ব্যাপারেও কৃষকগণের ধারণা খুবই সীমিত। একমাত্র মাটি পরীক্ষা করেই বলা যায় কোন জমিতে কোন ফসল চাষ করলে কি পরিমাণ পুষ্টি উপাদান বাহির থেকে যোগ করতে হবে। ফসলী জমির মাটি পরীক্ষা করিয়ে এবং ফসলের অবশিষ্টাংশ মাটিতে যোগ করে সমন্বিত পুষ্টি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অনুসরণ করলে ফসলের মাঠে রাসায়নিক সারের পরিমাণ কম লাগে। এতে একদিকে যেমন রাসায়নিক সারের সাশ্রয় হয় তেমনি মাটির স্বাস্থ্যও ভাল থাকে।

প্রযুক্তির বর্ণনা

রবি মৌসুমের শুরুতে পূর্ববর্তী আমন ধান কাটার পর মাঠ থেকে ০-১৫ সেমি গভীরতায় মৃত্তিকা নমুনা সংগ্রহ করে তা পরীক্ষাগারে বিশ্লেষণ করিয়ে জানতে হবে মাটিতে কোন পুষ্টি উপাদান কত পরিমাণে আছে। মাটিতে বিদ্যমান পুষ্টি উপাদানের পরিমাণ থেকে হিসাব করে বের করতে হবে ফসল বিন্যাসের কোন ফসলে কী পরিমাণ পুষ্টি উপাদান সারের মাধ্যমে যোগ করতে হবে। এরপর দেখতে হবে বছরের ফসল বিন্যাসের মধ্যে কোন কোন ফসলের অবশিষ্টাংশ মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া যায়। গম-আউশ-আমন ফসল বিন্যাসে শুধুমাত্র ৫০% আউশের খড় মাটিতে মেশানোর সুযোগ রয়েছে। অপরদিকে মুগ-আউশ-আমন ফসল বিন্যাসে মুগ ফসল তোলার পর ১০০% মুগ গাছ এবং ৫০% আউশের খড় মাটিতে মেশানো যায়।

মাটিতে মিশিয়ে দেয়া ফসলের অবশিষ্টাংশ থেকে কত পরিমাণ পুষ্টি উপাদান পরবর্তী ফসল পাবে তা হিসাব করে বের করতে হবে। মাটি পরীক্ষা করে প্রাপ্ত প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানের পরিমাণ থেকে ফসলের অবশিষ্টাংশ দ্বারা যোগকৃত পরিমাণ বিয়োগ করতে হবে। এভাবে প্রাপ্ত পুষ্টি উপাদানের পরিমাণ রাসায়নিক সার প্রয়োগের মাধ্যমে ফসলের মাঠে যোগ করতে হবে। রাসায়নিক সার প্রয়োগের জন্য প্রচলিত অনুমোদিত পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে। প্রকল্পের গবেষণা কার্যক্রম থেকে গম-আউশ-আমন এবং মুগ-আউশ-আমন ফসল বিন্যাসের জন্য সমন্বিত পুষ্টি ব্যবস্থাপনা ভিত্তিক সার সুপারিশমালা উদ্ভাবন করা হয়েছে যা নিচের সারণীতে দেখানো হয়েছে:

ভোলা জেলার দুইটি নিবিড় শস্য বিন্যাসের জন্য উদ্ভাবিত সার সুপারিশমালা

ফসল বিন্যাস	সার সুপারিশ: ইউরিয়া-টিএসপি-এমওপি-জিপসাম-দস্তা-বরিক এসিড (কেজি/হে.)			ফসলের অবশিষ্টাংশ মাটিতে মিশিয়ে দেয়া
গম-আউশ-আমন	গম	আউশ	আমন	
	২৪২-১৬৯-১১৯-৭৮-৩-১.৫	১৫১-৮১-৪৭-৫০-১.৫	১৬৭-৭৫-২২-৬৬-১.৫	৫০% আউশের খড়
মুগ-আউশ-আমন	মুগ	আউশ	আমন	
	৩৫-১২৪-২৬-৮১-৫-১.৫	১০৬-৬৯-১৬-৪৭-৩	১৬০-৬৭-৯-৬২-৩	১০০% মুগের গাছ + ৫০% আউশের খড়

প্রযুক্তি ব্যবহারে খরচ ও লাভের পরিমাণ

উদ্ভাবিত প্রযুক্তি ব্যবহারে বাড়তি কোন খরচ হয় না বরং রাসায়নিক সার সাশ্রয়ের ফলে উৎপাদন ব্যয় কম হয়। উদ্ভাবিত সমন্বিত পুষ্টি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি ব্যবহারে প্রকল্পের আওতাধীন জমিতে গম-আউশ-আমন ফসল বিন্যাসে পার্শ্ববর্তী কৃষকের জমির তুলনায় গমের ফলন শতকরা ১৫.২ ভাগ, আউশ ধানের ফলন শতকরা ২৭.৫ ভাগ এবং আমন ধানের ফলন শতকরা ১১.৪ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। একইভাবে মুগ-আউশ-আমন ফসল বিন্যাসে মুগডালের ফলন শতকরা ৩১.৪ ভাগ, আউশ ধানের ফলন শতকরা ৩৬.৬ ভাগ এবং আমন ধানের ফলন শতকরা ১১.৬ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রযুক্তি ব্যবহারে আয়-ব্যয়ের হিসাব নিচের সারণীতে দেয়া হলো:

প্রযুক্তি ব্যবহারে খরচ ও লাভের হিসাব

ফসল বিন্যাস	ধানের তুল্য ফলন (টন/হে.)	ব্যয় (টাকা/হে.)	আয় (টাকা/হে.)	লাভ (টাকা/হে.)	আয় ও ব্যয়ের অনুপাত
গম-আউশ-আমন	১৫.৩০	১৩৭৯৫০/-	২৪৪৭৯০/-	১০৬৮৪০/-	১.৭৭
মুগ-আউশ-আমন	১৪.৬৩	১২৪৭৮০/-	২৩৪০৭০/-	১০৯২৯০/-	১.৮৮

প্রধান গবেষক: ড. মোঃ শহীদুল ইসলাম, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ভোলা, মোবাইল: ০১৭১৮-৬৩৮৭৭১

১.৬ জমিতে বহু ফসল চাষের ক্ষেত্রে মাটির উর্বরতা অক্ষুন্ন রাখার জন্য উন্নত ব্যবস্থাপনা

ফসল চাষে আজকাল উচ্চ মাত্রার রাসায়নিক সার ব্যবহার করা হয়। জৈব সার যেমন, গোবর, নাড়া, খড়, কম্পোস্ট ইত্যাদি একেবোরেই দেওয়া হয় না বা খুব কম ও অনিয়মিতভাবে দেওয়া হয়। যার ফলে মাটির উর্বরতা বা বল দিন দিন কমে যাচ্ছে। সহজে পাওয়া যায় এমন জৈব পদার্থ যেমন, ধানের খড়, বায়োচার, মুরগির বিষ্ঠা, গোবর ইত্যাদি) ব্যবহারের মাধ্যমে মাটিতে জৈব পদার্থ বাড়িয়ে এর উর্বরতা বজায় রাখা সম্ভব। জৈব পদার্থের ঘাটতি ছাড়াও মাটিতে অন্যান্য সমস্যা থাকতে পারে যেমন, অনেক জায়গায় অ্যাসিড মাটি থাকে যেখানে গাছের কিছু পুষ্টি বা খাবার ঘাটতি হতে পারে।

বিভিন্ন জৈব পদার্থ থেকে তৈরি বায়োচার যা মাটিতে ব্যবহার করা যায়

অ্যাসিড মাটিতে গাছের জন্য ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম এবং ফসফরাসের ঘাটতি দেখা যায়। বাংলাদেশের অনেক অঞ্চলে সেচের পানিতে আর্সেনিক নামক একটি বিষাক্ত পদার্থ

বেশী পরিমাণে পাওয়া গেছে। সে সব অঞ্চলে সেচের পানি থেকে মাটিতে এই আর্সেনিক বিষ জমে গিয়ে ফসলের জন্য ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়। ফরিদপুর অঞ্চলে মাটিতে এমন আর্সেনিক বিষের প্রভাব দেখা গেছে। এ রকম আর্সেনিক দূষিত মাটিতে বায়োচার ব্যাবহারে মাটি থেকে আর্সেনিক দূষণ কমিয়ে ফেলা যায়। কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে গবেষণায় দেখা গেছে, বায়োচার ব্যবহার মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ বাড়ায় যার ফলে মাটির বল বাড়ে, মাটির স্বাস্থ্যের উন্নতি হয় এবং ফসলের উৎপাদন বাড়ে।

প্রকল্পের মাধ্যমে উদ্ভাবিত/নির্বাচিত প্রযুক্তির বর্ণনা

- ধান কাটার পর বাকি খড় জমিতেই রেখে দিলে তা মাটিতে নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশিয়াম ও সালফারের যোগান দেয়। এতে মাটির উর্বরতা দীর্ঘস্থায়ী হয়, বিশেষ করে মাটিতে পটাশিয়াম বাড়ার ফলে তা পরবর্তীতে আলু ফসলের ফলন বাড়াতে সহায়তা করে।
- বায়োচার এবং ধান ও মসুরের খড়-নাড়া ফসল কাটার পর মাটিতেই রেখে দিলে মাটির উর্বরতা বাড়ে।
- বায়োচর প্রয়োগে স্থায়ীভাবে মাটির জৈব পদার্থ বাড়ে যা ফসলের ফলন বাড়াতে সহায়তা করে।
- বায়োচার মাটিতে আর্সেনিকের বিষাক্ত প্রভাব কমায়, এতে ফসলে ক্ষতির পরিমাণ কমে।

কিভাবে কৃষক পর্যায়ে এই প্রযুক্তি প্রয়োগ করা যাবে

- কৃষক ধান কাটার পর ধানের খড়ের দুই-তৃতীয়াংশ মাটিতে মিশিয়ে দিতে পারেন।
- ধানের খড় ও তুষ "পাইরোলাইসিস" (উচ্চ তাপমাত্রা ও অক্সিজেনহীন অবস্থা) পদ্ধতিতে কৃষকের মাঠেই সহজে বায়োচার তৈরি করা সম্ভব।

এই প্রযুক্তি ব্যবহারে খরচ ও লাভের পরিমাণ

- মাটিতে ধান ও মসুরের খড়-নাড়া ব্যাবহারে কোন খরচ নেই।
- বায়োচর তৈরির কাঁচামাল কৃষকের নিজের কাছেই আছে। তা থেকে বায়োচার তৈরি প্রক্রিয়ায় যে সামান্য খরচ হয় তা লাভের তুলনায় অতি নগণ্য।

এই প্রযুক্তির দ্রুত সম্প্রসারণের জন্য কি কি করা প্রয়োজন

- প্রযুক্তি ব্যবহারে মাঠ পর্যায়ে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মী ও কৃষকের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।
- প্রযুক্তি ব্যবহারকারীদের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।
- এই প্রযুক্তিসমূহ সংশ্লিষ্ট সকলের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে আরো সম্প্রসারণমূলক প্রকল্প গ্রহণ করা প্রয়োজন।

প্রধান গবেষক: প্রফেসর ড. জিকেএম মোস্তাফিজুর রহমান, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সালনা, গাজীপুর, মোবাইল: ০১৭১৮-১৮৬৬৪২

১.৭ মৌচাষে উপজাত দ্রব্যাদির উৎপাদন বৃদ্ধি ও মানোন্নয়নের জন্য উন্নত প্রযুক্তি

প্রাচীন কাল হতে বাংলাদেশ মৌচাষ হয়ে আসছে। মৌচাষ হতে প্রধানত যে উপজাত পাওয়া যায় তা হচ্ছে মধু। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কাঠের বাক্সে মৌচাষ শুরু করে। তন্মধ্যে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা (বিসিক) অন্যতম। বিসিক ১৯৭৭ সালে গাজীপুরের কোনাবাড়ীতে দেশিয় প্রজাতির মৌমাছি (*Apis cerana*) চাষে সর্বপ্রথম সাফল্য পায়। পরবর্তীতে তা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ধীরে ধীরে সম্প্রসারিত হয়। কিন্তু ১৯৮৯-৯০ সালের দিকে থাই স্যাকব্রুড রোগের কারণে দেশিয় প্রজাতির মৌমাছির চাষ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়।

পরবর্তীতে কিছু মৌচাষি, বিসিক এবং এনজিও 'প্রশিকা' বিদেশি (ইউরোপীয়) প্রজাতির মৌমাছির (*Apis mellifera*) চাষ বাংলাদেশে প্রবর্তন করে। কিন্তু যুগোপযোগী প্রযুক্তির অভাবে তারা শুধুমাত্র মধু উৎপাদনে সীমাবদ্ধ থেকেছে।

এছাড়াও, প্রয়োজনীয় উপকরণ ও প্রযুক্তির অভাবে চাষি পর্যায়ে যে মধু উৎপাদিত হতো তা নিম্ন মানের, বেশির ভাগ সময় মধুর আর্দ্রতা ২২% এর উপরে থাকত। শুধু তাই নয়, ব্রুড বাক্স থেকে মধু আহরণের ফলে মৌমাছির ডিম, লার্ভা এবং পোলেন ক্ষতিগ্রস্ত হতো। অন্যদিকে, মৌচাষের অন্যান্য উপজাত যেমন, পোলেন (পরাগরেণু), প্রপলিজ (মৌ-আঁঠা), রয়েল জেলি এবং মৌ-বিষ, ইত্যাদির উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে ইতিপূর্বে কোন প্রতিষ্ঠান কাজ করেনি। শুধু তাই নয়, ভালো জাতের উর্বর মৌ-রাণীর চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। এসকল বিষয় সামনে রেখে কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন (কেজিএফ)-এর পৃষ্ঠপোষকতায় মধুর মান উন্নয়ন, পোলেন ও প্রপলিজ উৎপাদন, উৎকৃষ্ট জাতের মৌ-রাণী উৎপাদন, ক্রান্তিকালে বা অসময়ে মৌমাছি কলোনির সুষ্ঠু পরিচর্যা, মৌমাছির জন্য কৃত্রিম খাদ্যের উৎপাদন ও মৌমাছির রোগবালাই সনাক্তকরণ সম্বলিত উন্নত মৌচাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবনের লক্ষ্যে শের-এ-বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকগণ এই তিন বছর মেয়াদি প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করেন।

উদ্ভাবিত প্রযুক্তির বর্ণনা

আধুনিক মৌ-বাক্স (পলিহাইভ)

এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে মৌচাষিরা সহজে মৌমাছি পালন করতে পারেন। এই বাক্সটি তাপরোধক ফুডগ্রেড প্লাস্টিক দিয়ে তৈরী যার ভিতর মৌমাছি অধিক কর্মক্ষম থাকে। এই বাক্স প্রচলিত কাঠের বাক্সের তুলনায় অধিক টেকসই। এতে প্রায় চল্লিশ হাজার মৌমাছি বসবাস করতে পারে। প্রচলিত কাঠের ব্রুড বাক্সের তুলনায় এই বাক্সে মধুর ফলন প্রায় ৩০% বেশি হয়ে থাকে। এছাড়া, প্রচলিত বাক্সের মধুতে আর্দ্রতা ২২% থেকে ২৬% পর্যন্ত হয়ে থাকে, কিন্তু পলিহাইভ মৌ-বাক্সে মধুর আর্দ্রতা ১৯%-২২% এ নেমে আসে যা মধুর গুণ ও মান বাড়িয়ে তোলে।

এ বাক্স থেকে উৎপাদিত মধু পরিস্কার-পরিচ্ছন্নও হয়ে থাকে। এই বাক্সটি সহজই এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নেয়া যায়, যার ফলে একজন মৌচাষি বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জায়গায় ফুলের উৎসস্থলে এটি নিয়ে যেতে পারেন। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কারণে পলিহাইভ বাক্সে প্রচলিত বাক্সের তুলনায় মৌমাছি রোগ ও পোকামাকড় দ্বারা কম আক্রান্ত হয়। মৌমাছির প্রাকৃতিক খাদ্য সংকটকালীন সময়ে এই বাক্সের ভিতরের মৌমাছির জন্য সহজেই কৃত্রিম খাবার প্রদান করা যায়। এই বাক্সটির অভ্যন্তরে একটি "পোলেন ট্র্যাপ" বা পরাগরেণু সংগ্রহপাত্র রয়েছে যা প্রতিদিন সঠিকভাবে ১ ঘন্টা করে ব্যবহার করলে মৌসুমে কমপক্ষে ৫০০ গ্রাম পোলেন সংগ্রহ করা যায়। একইভাবে এটিতে "প্রপলিজ" বা মৌ-আঁঠা সংগ্রহপাত্র থাকে যাতে একটি বাক্স থেকে কমপক্ষে ১২৫ গ্রাম প্রপলিজ উৎপাদন করা যায়। একটি ভাল উর্বর মৌ-রাণী এই বাক্সে গড়ে কমপক্ষে ১৫০০ পর্যন্ত ডিম দিয়ে থাকে। ফলে বছরব্যাপী মৌমাছি সঠিক সংখ্যায় থাকে এবং এক বছরেই একটি মৌ-কলোনী থেকে দুই বা ততোধিক কলোনি উৎপাদন করা যায়।

কৃত্রিম মৌ-রাণী উৎপাদন

মৌ-রাণী উৎপাদনের উপকরণসমূহ ব্যবহার করে গ্রাফটিংয়ের ঝামেলা ছাড়াই নাইকো পদ্ধতিতে রাণী উৎপাদন করা যায়। যেহেতু নাইকোর মাধ্যমে লার্ভার বয়স জানা যায় সেহেতু ভাল রাণী উৎপাদনে এটি কার্যকর ভূমিকা রাখে। এ থেকে উৎপাদিত রাণীর সঠিক সংখ্যক (১২-১৫ টি) পুরুষের সাথে মিলন হলে রাণী কমপক্ষে তিন বৎসর ডিম দেয়ার ক্ষমতা রাখে।

রাণীর কৃত্রিম প্রজনন

প্রাকৃতিক ভাবে উৎপাদিত রাণী বছরের সব সময় সঠিকভাবে প্রজনন ক্রিয়ায় অংশ নিতে পারে না। সেজন্য ড্রোন বা পুরুষ মৌমাছি উৎপাদনের মাধ্যমে ভাল জাতের পুরুষ মৌমাছির শুক্রাণু সংগ্রহ করে কুমারী রাণী গবেষণাগারে মাইক্রোস্কোপের নিচে বিশেষ ধরনের যন্ত্র ও সূঁচের মাধ্যমে প্রজনন ঘটানো হয়। এ ধরণের কৃত্রিম প্রজননকৃত রাণীর ডিম থেকে তিন থেকে চার বছর পর্যন্ত ভাল মানের কার্যক্ষম রাণী তৈরি করা যায়। এটিই একমাত্র কৃত্রিম প্রযুক্তি যা উন্নত বিশ্বে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। বছরে যেখানে একটি মৌ-কলোনি থেকে ২-৩টি কুমারী রাণী উৎপাদন করা যায় সেখানে কৃত্রিম পদ্ধতিতে প্রতি মাসে ১টি শক্তিশালী কলোনি থেকে ১৫-২০টি রাণী উৎপাদন করা যায়। সে হিসাবে বছরে একটি পলিহাইভ বাক্স থেকে কমপক্ষে ১৮০টির মত ভাল কুমারী রাণী উৎপাদন করা যায়।

কৃত্রিম খাদ্য ব্যবস্থাপনা

মৌ-কলোনি থেকে সংগ্রহকৃত পোলেনের সাথে মিশিয়ে কৃত্রিম খাবার দিলে মৌ-কলোনির মৌমাছির স্বাস্থ্য ভাল থাকে এবং তারা কর্মক্ষম থাকে।

এই প্রযুক্তি ব্যবহারে খরচ ও লাভের পরিমাণ

একাদিক্রমে তিন বছর মৌচাষের একটি তুলনামূলক হিসাবে দেখা যায়, প্রচলিত পদ্ধতিতে ১ম বছরে বাক্স, মৌ-কলোনি, কৃত্রিম খাবার, শ্রমিক, ব্যবস্থাপনা ও পরিবহন বাবদ ব্যয় হয় ১০,০০০ টাকা, ২য় (বাক্স ও কলোনী বাবদ ব্যয় নেই) ও ৩য় বছরে (কলোনি বাবদ ব্যয় নেই) যথাক্রমে ৩,০০০ ও ৫,০০০ টাকা এবং মধু ও কলোনি বিক্রয় করে তিন বছরে নীট লাভ ৪,৫০০ টাকা। পক্ষান্তরে, উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারে ব্যয় ১ম বছরে (বাক্স, মৌ-কলোনি, কৃত্রিম খাবার, শ্রমিক, ব্যবস্থাপনা ও পরিবহন বাবদ) ২৮,০০০ টাকা এবং ২য় ও ৩য় বছরে ৩,০০০ টাকা করে, এবং মধু, মৌ-কলোনি, পোলেন ও মৌ-আঁঠা বিক্রয় করে তিন বছরে নীট লাভ হয় ১৫,৫০০ টাকা। এখানে উল্লেখ্য যে, পোলেন, মৌ-আঁঠা এবং মৌকলোনি বাজারজাত করার এবং ন্যায্যমূল্যে মধু বিক্রয়ের নিশ্চয়তা থাকতে হবে। এপিয়ারী নিয়ে বাণিজ্যিকভাবে মৌচাষ করতে গেলে দুই প্রযুক্তির ক্ষেত্রে সমান ব্যয় বেড়ে যাবে। সেজন্য সে সকল ব্যয় মূল ব্যয়ের আওতায় আনা হয়নি।

প্রধান গবেষক: প্রফেসর ড. মোঃ সাখাওয়াত হোসেন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, শেরে-ই-বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, মোবাইল: ০১৭১৬-০৯২৭৪৭

১.৮ সাদা ভুট্টা উৎপাদন প্রযুক্তি ও ব্যবহার

বাংলাদেশে বর্তমানে যে হলুদ রংয়ের ভুট্টার চাষ হচ্ছে তা মানবখাদ্য হিসেবে তেমন জনপ্রিয় নয়। বর্তমানে উৎপাদিত হলুদ ভুট্টার প্রায় পুরোটাই পশুপাখির খাবার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। মানবখাদ্য হিসেবে যে ভুট্টা সারা বিশ্বে চাষাবাদ হয়ে থাকে তার দানার রং সাদা। এ কারণে এ ভুট্টাকে সাদা ভুট্টা বলা হয়। সাদা ভুট্টার আটা হলুদ ভুট্টার চাইতে মিহি এবং এর আটা দিয়ে নানা রকম খাবার তৈরি করা যায়। তাছাড়া, সাদা ভুট্টায় হলুদ ভুট্টার তুলনায়, আমিষের পরিমাণ বেশি। চালের তুলনায় সাদা ভুট্টায় গ্লাইসেমিক ইনডেক্স কম থাকার কারণে ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য সাদা ভুট্টার খাবার চালের তৈরি খাবারের চাইতে আধিক নিরাপদ।

মানবখাদ্য হিসেবে ভুট্টার আবাদ ও ব্যবহার বাড়াতে কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং এগ্রেরিয়ান রিসার্চ ফাউন্ডেশন তিন বছর ধরে মানুষের খাবার উপযোগী ভুট্টার ৪৯টি জাতের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বাংলাদেশে আবাদ উপযোগী কয়েকটি জাত নির্বাচন করেছে এবং এ সকল জাতের ভুট্টা চাষের জন্য উপযুক্ত উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে।

বাংলাদেশে সাদা ভুট্টা উৎপাদন প্রযুক্তি

বাংলাদেশে সাদা ভুট্টা উৎপাদনের জন্য উপযোগী ভূমি ও মাটির প্রকৃতি, উপযুক্ত ভুট্টা জাত এবং এই ভুট্টা আবাদে প্রয়োজনীয় চাষ পদ্ধতি, ফসল পরিচর্যা, ইত্যাদি নিম্নে বর্ণিত হল:

ভূমি ও মাটি: বন্যামুক্ত ভূমির বেলে-দোআঁশ ও দোআঁশ মাটি সাদা ভুট্টা চাষের জন্য উপযোগী।

বপনের সময়: রবি মৌসুমে মধ্য-আশ্বিন থেকে মধ্য-অগ্রহায়ণ (অক্টোবর-নভেম্বর) এবং খরিফ মৌসুমে ফাল্গুন থেকে মধ্য-চৈত্র (মধ্য-ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চ) পর্যন্ত সময় বীজ বপনের উপযুক্ত সময়।

বীজের হার ও বপন পদ্ধতি: হেক্টরপ্রতি ২৫-৩০ কেজি হাইব্রিড ভুট্টার বীজ। সারিতে বুনতে হবে। সারি থেকে সারির দূরত্ব হবে ৫০ সেমি। সারিতে ২৫ সেমি দূরত্বে ১ টি গাছ রাখতে হবে।

জাত: ধামরাই, ঢাকা: চ্যাংনু-১, চ্যাংনু-৬, কিউ-জিয়াংনু-১ ইয়াংনু ৩০; রংপুর: চ্যাংনু-১; বান্দরবান: পি এস সি-১২১, সিমিট ১৫০০৮; দিনাজপুর: পি এস সি-১২১; নিলফামারি: পি এস সি-১২১, ইয়াংনু-৩০ ও চ্যাংনু-৬।

প্রতি বিঘা (৩৩ শতক) জমিতে সারের পরিমাণ (কেজি)		
সার	মধ্যম মাত্রার উর্বর জমি	নিম্ন মাত্রার উর্বর জমি
ইউরিয়া	৬৭	৮৩
টিএসপি	৩৩	৪২
এমওপি	২৭	৩৩
জিপসাম	৩৩	৪২
বরিক অ্যাসিড	২	২
জিংক সালফেট	১	১
গোবর*	সাধ্যানুযায়ী	সাধ্যানুযায়ী

* গোবর সার ব্যবহার করলে বিঘা প্রতি রাসায়নিক সারের মাত্রা কিছুটা কমে যাবে

জমি তৈরি ও বীজ বপন: ভুট্টার জমি ভালভাবে তৈরি করে সময়মত বীজ বপন করতে হয়। জমিতে যথেষ্ট পরিমান রস না থাকলে জমি চাষের পূর্বে হালকা করে সেচ দিতে হবে। উপযুক্তভাবে জমি চাষের পর উত্তর-দক্ষিণে সারি করে বীজ বপণ করতে হবে। সারি হতে সারির দূরত্ব প্রায় ৫০ সেমি. (২০ ইঞ্চি) এবং সারিতে এক গাছ হতে আর এক গাছের দূরত্ব প্রায় ২০-২৫ সেমি. (৮-১০ ইঞ্চি) হতে হবে। প্রতিটি গর্তে ১ - ২ টি করে বীজ বপন করতে হবে। গজানোর ১৫ দিন পর প্রতি গর্তে একটি চারা রেখে বাকি চারা তুলে ফেলতে হবে।

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি: শেষ চাষের সময় ইউরিয়ার এক তৃতীয়াংশ এবং বাকি সব সার ভালভাবে জমিতে মিশিয়ে দিতে হবে। চারা গজানোর ২০-২৫ দিন পর (৪-৬টি পূর্ণ পাতা) ইউরিয়ার এক তৃতীয়াংশ প্রথম উপরি প্রয়োগ করতে হবে। চারা গজানোর ৩৫-৪০ দিন পর (১০-১২ পূর্ণ পাতা) ইউরিয়ার এক তৃতীয়াংশ দ্বিতীয় ও শেষ উপরি প্রয়োগ করতে হবে।তবে ইউরিয়া সারের উপরি প্রয়োগ করার সময় খেয়াল রাখতে হবে যাতে সার দেয়ার সময় মাটি ভেজা থাকে। মাটির উপরিভাগ শুকনো থাকলে ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ করার পর এমনভাবে একটি হালকা সেচ প্রয়োগ করতে হবে যাতে পানির পরিমাণ বেশি হয়ে পানি পাশের নিচু স্থানে গিয়ে জমা না হয়। ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ করার সময় হলে দেখতে হবে জমিতে সেচ দেয়ার প্রয়োজন আছে কিনা। যদি সেচ দেয়ার প্রয়োজন হয় তা

হলে সেচ দেয়ার পরে যে সময় গাছের পাতা শুকনো অথচ মাটির উপরিভাগে সেচের পানি জমে নেই এ সময়ে ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে। গাছের পাতা ভেজা থাকা আবস্থায় ইউরিয়া সার প্রয়োগ করলে পাতা পুড়ে যায় আবার ভর দুপুরে ইউরিয়া সার প্রয়োগ করলে কিছুটা ইউরিয়া সার উবে গিয়ে অপচয় হয়।

সেচ প্রয়োগ: ভুট্টা চাষের জন্য জমিতে যথেষ্ট পরিমাণ রস থাকা দরকার। বৃষ্টি না হলে এবং জমিতে রসের ঘাটতি হলে জমিতে সেচ প্রয়োগ করতে হবে। গাছের ২০ হতে ২৫ দিন বয়সে ৪ হতে ৬ টি পূর্ণ পাতা হওয়ার পর প্রথম সেচ, ৩৫-৪০ দিন বয়সে গাছে ১০-১২ টি পূর্ণ পাতা হওয়ার পর দ্বিতীয় সেচ, গোছের ৬৫-৭৫ দিন বয়সে মোচা বের হওয়ার পর তৃতীয় সেচ এবং মোচা বের হওয়ার ৩ সপ্তাহ পর অর্থাৎ গাছের বয়স ৯০-১০০ দিন হলে চতুর্থ সেচ প্রয়োগ করতে হবে। তবে জমিতে রসের ঘাটতি না হলে বা জমির রসের প্রাপ্যতা ভেদে দু' একটি সেচ কম দেয়া গেলে ভুট্টার উৎপাদন খরচ কমে যাবে। প্রতি সেচের পর জমি শুকানোর পর্যায়ে মাটির উপরি স্তর ভেজা থাকা আবস্থায় ইউরিয়া সারের বকেয়া কিস্তির প্রয়োগ করতে হবে। প্রতি সেচের পর জমির মাটির জো অবস্থা আসার সাথে সাথে পরের মাটি নিড়িয়ে দিতে হবে। গাছের বয়স বেশি হলে মাটিতে শিকড়ের বিস্তার অধিক থাকে বলে নিড়ানি এমনভাবে দিতে হবে যাতে শিকড় কাটা না পরে।

আগাছা ও পোকামাকড় দমন: ভুট্টা ক্ষেতে গাছের বয়স এক মাস হওয়া পর্যন্ত কোন আগাছা হতে দিতে হয় না। প্রতি সেচের পরে মাটির উপরিভাগে নিড়ানী ও গাছের গোড়ায় মাটি তুলে দেয়ার ফলে ভুট্টা ক্ষেতে আগাছার প্রকোপ কমে যায়। তাছাড়া ভুট্টা গাছ একটু বড় হলে আগাছা আপনি আপনি দমন হয়ে যায়। ভুট্টা বীজ বোনার সময় দু'লাইনের মাঝখানের মাটি পানিডা নামের আগাছা নাশকের দ্রবণ দিয়ে ভিজিয়ে দিলে ক্ষেতে প্রায় কোন আগাছা জন্মায় না।

রোগবালাই দমন: ভুট্টা ক্ষেতে রোগবালাইয়ের প্রকোপ তেমন একটা দেখা যায় না। বিচ্ছিন্নভাবে কিছু কিছু গাছে এ্যাফিড ও মোচার ডগায় ক্যাটারপিলার এর আক্রমণ হতে দেখা যায়। এমনটি দেখা গেলে জমিতে প্রয়োজনীয় কীটনাশক প্রয়োগ করতে হবে ।

পাকা ভুট্টা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ: ভুট্টার দানা পুষ্ট হওয়ার পর দ্রুত পাকতে শুরু করে। এই সময়ে ভুট্টার সবুজ মোচা বিবর্ণ হয়ে শুকিয়ে খড়ের রং ধারণ করে। এ অবস্থায় মোচা থেকে ছাড়ানো বীজের গোড়ায় কালো দাগ দেখা যাবে। ভুট্টা গাছের মোচা ৭৫-৮০% পরিপক্ক হলে ভুট্টা সংগ্রহ করা যাবে। সংগৃহীত মোচা ২-৩ দিন রোদে শুকাতে হবে এবং শুকনো দানা মোচা হতে ছাড়াতে হবে। ভুট্টার দানা ছাড়ানোর পর ২-৩ দিন ধরে রোদে শুকাতে হবে। শুকনো দানা পলিথিন ব্যাগ, প্লাষ্টিকের ব্যাগ অথবা টিনের পাত্রে বায়ুরোধী করে রেখে দিতে হবে । খেয়াল রাখতে হবে যেন দানায় পোকার আক্রমণ না হয়। দীর্ঘ দিনের জন্য সংরক্ষণ করতে হলে মাঝে মধ্যে রোদে শুকিয়ে আবার বায়ুরোধী পাত্রে সংরক্ষণ করতে হবে ।

সাদা ভুট্টার রুটি

উন্নত চাষাবাদ পদ্ধতিতে সাদা ভুট্টা আবাদে খরচ ও লাভের পরিমাণ

খরচের খাত* (বিঘাপ্রতি)	শ্রমিক সংখ্যা	শ্রমিকের খরচ (টাকা)	আন্যান্য খরচ
জমি সাফ করা, তৈরি ও সার প্রয়োগ	২	৬০০	চাষ: ২০০
বীজ বপন	২	৬০০	
গাছের ৪-৬ টি পূর্ণ পাতা আবস্থায় আগাছা দমন, প্রথম সেচ, ইউরিয়া সারেব দ্বিতীয় কিস্তির উপরিপ্রয়োগ এবং নিড়ানি দেয়া	৪	১২০০	সার ৪৫০*
গাছের গোড়ায় মাটি তোলা	১	৩০০	

খরচের খাত* (বিঘাপ্রতি)	শ্রমিক সংখ্যা	শ্রমিকের খরচ (টাকা)	আন্যান্য খরচ
গাছের ১০-১২ টি পূর্ণ পাতা আবস্থায় আগাছা দমন, দ্বিতীয় সেচ, ইউরিয়া সারের তৃতীয় কিস্তির উপরি প্রয়োগ ও গাছের গোড়ায় তোলা মাটি উঁচিয়ে দেয়া । গাছের মোচা হওয়া আনস্থায় তৃতীয় সেচ প্রয়োগ মোচা বের হওয়ার ৩ সপ্তাহ পর চতুর্থ সেচ প্রয়োগ	৩	৯০০	৪ টি সেচ ৬০০
পোকা মাকড় দমন			৩০০
মোচা সংগ্রহ, মোচা শুকানো, দানা ছাড়ানো ও দানা শুকানো	৭	২১০০	
বিঘা প্রতি মোট খরচ			৬০০
আয়ের খাত (বিঘা প্রতি)			
দানা হতে আয় (প্রতি বিঘায় ৮ টন হারে ১০৬৬ কেজি)			১৭১৫৮
খড় হতে আয় (প্রতি বিঘায় ৮ টন হারে ১০৬৬ কেজি)			১১৪৪
মোট লাভ ১৭১৫৮+ ১১৪৪			১৮৩০২
নীট লাভ ১৮৩০২ - ৬৬৫০			১১৬৫২
*জমির খাজনা, লীজ মূল্য, পরিচালনা খরচের উপর সুদ ধরা হয় নি।			

সাদা ভুট্টার ব্যবহার

সাদা ভুট্টার আধা পুষ্ট দানা সরাসরি, পুড়িয়ে বা সিদ্ধ করে খাওয়া যায়। গম বা চালের আটা দিয়ে যে সকল খাবার তৈরি করা যায়, ভুট্টার আটা দিয়েও সে সকল খাবার তৈরি করা যায়। তবে ভুট্টার আটায় আঠালো গ্লুটেন বেশি থাকার কারণে ভুট্টার আটার সাথে ২৫-৩০ ভাগ গমের আটা মিশিয়ে নিতে হয়। ভুট্টার আটা দিয়ে রুটি, পরোটা, লুচি, পুরি, ফিরনি, মাল পোয়া, পাকুড়া, কেক, সবজির রোল, সিঙ্গারা ইত্যাদি খাবার তৈরি করা যায় ।

প্রধান গবেষক: প্রফেসর ড. মোঃ জাফর উল্লাহ, কৃষিতত্ত্ব বিভাগ, শেরে-ই-বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, মোবাইল: ০১৫৫২-৩৩১৬০৫

১.৯ ফল ও সবজির বাজার ব্যবস্থাপনা এবং ভ্যালুচেইন: নিরাপদ খাদ্য ভাবনা

কৃষকগণ তাঁদের অর্থ ব্যয় ও পরিশ্রম করে যে ফসল উৎপাদন করেন তা দ্রুত ও লাভজনকভাবে বাজারজাত হওয়া ও ভোক্তার হাতে পৌঁছার বিষয়টি দেশের কৃষিতে সুষ্ঠু ও নিরাপদ উৎপাদন-বিপণন-ভোগ ব্যবস্থার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে ফল ও সবজি উৎপাদন ও বিপণনের ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব অপরিসীম কারণ, ফল একটি দ্রুত পচনশীল পণ্য যা গাছ থেকে তোলার পরপরই স্বল্পতম সময়ে বাজারে ও ভোক্তার হাতে পৌঁছা বাঞ্ছণীয় যাতে তা খাদ্য হিসাবে সুস্বাদু ও নিরাপদ থাকে। গাছ থেকে ফল তোলা পরবর্তী সময়ে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করে দূরের কোন ভোক্তা জনগাষ্ঠীর কাছে নিয়ে যাওয়া এবং সরাসরি পণ্য ভোক্তার কাছে বাজারের চাইতে একটু বেশি মূল্যে বিক্রি করতে পারার একটি কার্যকর ব্যবস্থা সহজলভ্য হলে তা কৃষকের জন্য উৎসাহব্যঞ্জক ও লাভজনক হবে নিঃসন্দেহে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এমন একটি ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে তিন বছর ব্যাপী গবেষণার মাধ্যমে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট যৌথভাবে CDCS (Center for Development and Competitive Strategies) “G4G অর্ন্তভুক্তিমূলক কৃষি ব্যবসার মডেল” নামক একটি কৃষিপণ্য বিপণন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি উদ্ভাবন ও তার সফল প্রয়োগ করে।

কৃষিপণ্য বিপণন মডেল

এই "G4G অর্ন্তভুক্তিমূলক কৃষি ব্যবসার মডেল"টি বাস্তবায়নের গুরুত্বপূর্ণ ধাপগুলো হচ্ছে:

- ক্ষেত্র অনুসন্ধান এবং কৃষক সংগঠিতকরণ
- G4G কৃষি উদ্যোক্তা গ্রুপ গঠন
- G4G হাতে কলমে প্রশিক্ষণ
- মার্কেট ট্রায়াল
- G4G কৃষি ব্যবসা কেন্দ্র
- চূড়ান্ত বিক্রেতার (খুচরা বিক্রেতার) সাথে সংযোগ স্থাপন
- সাপ্তাহিক কৃষক বাজার, G4G মোবাইল, G4G কমিউনিটি ফারমার্স মার্কেটের মাধ্যমে সরাসরি বাজারে প্রবেশাধিকার
- করোনা সংকটকালীন সময়ে G4G অর্ন্তভুক্তিমূলক কৃষি ব্যবসা মডেল বাস্তবায়ন।

G4G মডেল ও তার সুফল

- অর্ন্তভুক্তমূলক কৃষিব্যবসা মডেল কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণে প্রয়োজনাতিরিক্ত মধ্যস্বত্বভোগীদের সংখ্যা কমিয়ে কৃষকদের জন্য ন্যায্য মূল্যের ব্যবস্থা করে একই সাথে ভোক্তার জন্য নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করে। সাধারণ অর্থে মডেলটির দুটি প্রধান উপকরণ রয়েছে ১) সংক্ষিপ্ত ভ্যালুচেইন এবং ২) ভোক্তার সাথে সরাসরি সংযোগ স্থাপন।
- মডেলের প্রধান বৈশিষ্ট্য- সংক্ষিপ্ত ভ্যালুচেইন যেখানে কৃষক জনগোষ্ঠি G4G নেটওয়ার্কের অর্ন্তভুক্ত পাইকারি এবং খুচরা বিক্রেতাদের মাধ্যমে নিরাপদ পণ্য বিক্রয় করতে পারে, আবার স্থানীয় পাইকারদের উপেক্ষা করে সরাসরি G4G নেটওয়ার্কের দূরবর্তী শহরের পাইকারদের কাছেও পণ্য পাঠাতে পারে।
- মডেলটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করেছে দ্বিতীয় পর্যায়ে যখন উদ্ভাবিত নবনির্মিত CDCS G4G মার্কেট: ১) G4G কমিউনিটি ফারমার্স মার্কেট ২) G4G মোবাইল ফারমার্স মার্কেট ও ৩) সাপ্তাহিক কৃষকের বাজারের সাথে কৃষক জনগোষ্ঠি যুক্ত হয়েছে।
- করোনা অতিমারির ক্রান্তিলগ্নে এই মডেলের অসাধারণ সাফল্য কৃষকদের অপূরণীয় ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করেছে এমন একটি সময়ে যখন সারা দেশের কৃষক স্থবির অবস্থায় তাঁদের উৎপাদিত পণ্য নিয়ে স্থানীয় বাজারে আহাজারি করছেন। এটি মডেলটির বলিষ্ঠতা এবং বিভিন্ন সংকট মোকাবেলায় এর উপযোগিতা প্রমাণ করে।

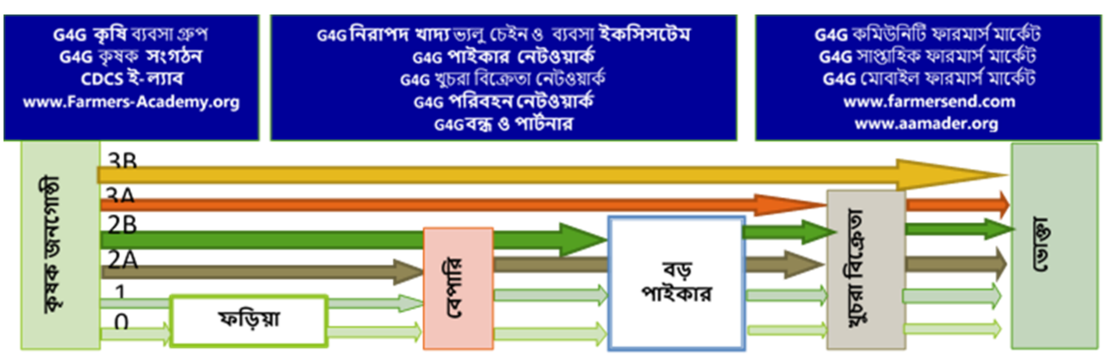

- প্রকল্পটির মাধ্যমে বেশ কিছু কৃষকের ব্র্যান্ড তৈরি করা হয়েছে যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য; ১) G4G কৃষিব্যবসা গ্রুপ, ২) G4G কৃষিব্যবসা কেন্দ্র, ৩) G4G কমিউনিটি ফারমার্স মার্কেট, ৪) G4G মোবাইল ফারমার্স মার্কেট, ৫) সাপ্তাহিক ফারমার্স মার্কেট, ৬) G4G এন্টারপ্রাইজ নেটওয়ার্ক, ৭) বিশেষায়িত নিরাপদ পণ্যের দোকান এবং ৮) "ফারমার্স এন্ড", কৃষকের বাজারজাতকরণের ই-প্লাটফর্ম।
- এছাড়াও কৃষক জনপদে শিক্ষা, তথ্য এবং প্রযুক্তি সম্প্রসারণের নিমিত্তে গঠিত ফারমার্স একাডেমির সাথে G4G কৃষক ও অন্যান্য অংশীজনদের যুক্ত করা হয়েছে।

G4G মডেল ব্যবহারে কৃষকের লাভ

- প্রগতিশীল কৃষক জনগোষ্ঠী মডেলটির সুফল পেতে শুরু করেছে। উদাহরণস্বরূপ, মাত্র তিন সপ্তাহের অপারেশনে (এটিও COVID-19 সঙ্কটের অধীনে), G4G কমিউনিটি ফার্মার মার্কেটের মডেল বাস্তবায়নে অংশ নেওয়া কৃষক জনগোষ্ঠী প্রায় ১৫-২০ টন কৃষি পণ্য বিক্রি করে প্রায় ৩০,০০,০০০ টাকা আয় হয়েছে, এবং এই জাতীয় সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে এখন তাঁরা নিজেরাই তাঁদের ব্যবসা এবং কার্যপ্রণালীতে যথাযথ পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা শুরু করেছেন।
- আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, কৃষকগণ উৎপাদন ও উৎপাদন পরবর্তী ব্যবস্থাপনার প্রযুক্তিগুলিতে তাৎপর্যপূর্ণ বিনিয়োগ করছেন (উদাহরণ: ফল এবং শাকসজির জন্য অটো হট ওয়াটার ট্রিটমেন্ট যন্ত্র স্থাপন)। এছাড়াও কৃষকগণ কেবলমাত্র দূরবর্তী পাইকার পয়েন্টে (ফরোয়ার্ড মার্কেট) ব্যবসায়ীদের সাথেই নয়, অন্যান্য কৃষক ও কৃষকগোষ্ঠির সাথেও নেটওয়ার্কিং শুরু করেছেন । উল্লেখ্য যে কৃষক পর্যায়ে এরূপ peer-to-peer নেটওয়ার্কিং এবং ব্যবসায়িক লেনদেন প্রতিষ্ঠা এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যগুলোর মাঝে ছিল না, এটি একটি বাড়তি পাওনা।

প্রধান গবেষক: সৈয়দা ফারজানা মোর্শেদ, ভ্যালু চেইন বিশেষ , সিডিসিএস, ঢাকা, মোবাইল: ০১৮২৮-৬৪৯৮৭৪

১.১০ পুষ্টি ব্যবস্থাপনা ও সুরক্ষা কৃষির মাধ্যমে মাটি ও ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি

বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য খাদ্যনিরাপত্তা বজায় রাখতে অধিক ফসল ফলানোর কারণে কৃষি জমির উর্বরতা ক্রমশ লোপ পাচ্ছে। উপযুক্ত মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা ও লাগসই চাষাবাদ পদ্ধতির মাধ্যমে এই প্রবণতা রোধ করে মাটি ও ফসলের উৎপাদনশীলতা বাড়ানো আবশ্যক। জমিতে বছরে একাধিক ফসল আবাদের ক্ষেত্রে একটি ফসল কাটার পর পরবর্তী ফসল সঠিক সময়ে ফসল রোপণ/বপন করা দরকার। জমি তৈরিতে কৃষিযন্ত্র ব্যবহার করে দু'টি ফসলের মধ্যবর্তী সময়টুকু সংক্ষিপ্ত করা যায় ও আশানুরূপ ফলন পাওয়া যায়। বাংলাদেশের কৃষকগণ বর্তমানে পাওয়ার টিলার দিয়ে ৩-৪ বার জমি চাষ করে ধান ও অন্যান্য ফসল ফলিয়ে থাকেন।

এই নিবিড় চাষ পরবর্তী ফসল রোপাতে বা বোনাতে প্রায়ই দেরী হয়ে যায়, ফলন কমে যায়। অতিরিক্ত চাষের কারণে মাটির জৈব পদার্থের পচন বেশী হয় ও এর পরিমাণ কমে যায়, মাটি উর্বরতা হারায়। এতে চাষাবাদের খরচও বাড়ে। এ কারণে কৃষিতে স্বল্প চাষ পদ্ধতিতে ধান ও অন্যান্য ফসলের চাষ বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশে ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুরক্ষা কৃষি (consevation agriculture) বলতে স্বল্প চাষে জমি তৈরি, ফসলের নাড়া জমিতে রেখে দেয়া ও মাড়াই শেষে খড় জমির মাটিতে মিশিয়ে দেয়া এবং সুবিধামত ফসলচক্র এই ব্যবস্থাপনাকে বুঝায়। এই পদ্ধতিতে ফসলের ফলন বৃদ্ধি পায়, চাষাবাদে খরচ কম হয় এবং জৈব পদার্থ বৃদ্ধির কারণে মাটির উর্বরতা রক্ষিত হয়। এ লক্ষ্যে কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বাকৃবি), ময়মনসিংহ রোপা আমন ধান-সরিষা-বোরো ফসল বিন্যাস বিষয়ে তিন বছরব্যাপী গবেষণা করে ও কৃষকের মাঠে প্রযুক্তি প্রর্দশনীর ব্যবস্থা করে। এই গবেষণায় ফসলচক্রের প্রতি ফসল চাষে বহুবিধ শস্য বপনযন্ত্রের (ভিএমপি যন্ত্র) সাহায্যে একবার ফালিচাষ (স্ট্রিপ চাষ) ও ৩০% খড় রেখে ফসল কাটা (উন্নত পদ্ধতি) এবং পাওয়ার টিলারের মাধ্যমে ৪ বার জমি চাষ ও ১৫%

খড় রেখে ফসল কাটা (কৃষক পদ্ধতি) এই দুই পদ্ধতির তুলনামূলক কার্যকারিতা পর্যবেক্ষণ করা হয়। প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয় ময়মনসিংহ জেলার মুক্তাগাছা ও ধনবাড়ি উপজেলায় কৃষকের জমিতে। প্রতি উপজেলায় ৩টি করে ব্লকের প্রতিটিতে ১০ বিঘা জমির একটি অংশে কৃষক পদ্ধতিতে ও অন্য অংশে সুরক্ষা/উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করে দেখা হয়।

সুরক্ষা কৃষি বা উন্নত পদ্ধতিতে চাষ প্রযুক্তির বর্ণনা

রোপা আমন (ব্রি ধান৪৯)

পূর্বের বোরো ধান কাটার সময় ধানের গোড়া থেকে ৩০% খড় রেখে ধান কাটা হয়। ধান রোপণের ৩ দিন পূর্বে রাউন্ড আপ প্রয়োগ করে আগাছা দমন করা হয় । কৃষক পদ্ধতির মতই রোপা আমন ধানের চারা তৈরি করা হয়। ভিএমপি মেশিনের মাধ্যমে এক বার ফালি চাষ করা হয়। জমিতে হেক্টর প্রতি ইউরিয়া, টিএসপি, পটাশ, জিপসাম ও জিংক সালফেট সার যথাক্রমে ১৯৫, ৬০, ৮০, ৫৫ ও ৬ কেজি হারে প্রয়োগ করা হয়। রোপণের ১০ দিন পর সুপারহিট দিয়ে প্রয়োগ করে আগাছা দমন করা হয়। ধান কাটার সময় ধানের গোড়া থেকে ৩০% খড় রেখে কাটা হয়।

সরিষা (বারি সরিষা ১৪)

রোপা আমন ধান কাটার পর ভিএমপি মেশিনের সাহায্যে একবার ফালি চাষ করা হয় এবং জমিতে সরিষা বোনা হয়। জমিতে ইউরিয়া, টিএসপি, পটাশ, জিপসাম ও বরিক এসিড সার যথাক্রমে হেক্টর প্রতি ১৯৫, ৭৫, ৬০, ৫৫ ও ৯ কেজি হারে প্রয়োগ করা হয়। সরিষা কাটার সময় গোড়া থেকে ৩০% কাণ্ড রেখে কাটা হয়।

বোরো ধান (ব্রি ধান২৮)

সরিষা কাটার পর ফেব্রুয়ারি মাসে জমিতে রাউন্ড আপ প্রয়োগ করে আগাছা দমন করা হয়। ভিএমপি মেশিনের সাহায্যে একবার ফালি চাষ করা হয়। কৃষক পদ্ধতির মতই বোরো ধানের চারা উৎপাদন করা হয়। ইউরিয়া, টিএসপি, পটাশ, জিপসাম ও জিংক সালফেট সার যথাক্রমে হেক্টর প্রতি ২৭০, ৫০, ১২০, ১০০ ও ২০ কেজি হারে প্রয়োগ করা হয়। ধান কাটার সময় ধানের গোড়া থেকে ৩০% খড় রেখে ধান কাটা হয়।

এই প্রযুক্তি ব্যবহারে খরচ ও লাভের পরিমাণ

সুরক্ষা কৃষি পদ্ধতিতে (যন্ত্রের সাহায্যে একবার চাষ, ৩০% খড় রেখে ফসল কাটা ও রাসায়নিক পদ্ধতিতে আগাছা দমন) কৃষক পদ্ধতির (পাওয়ার টিলারের সাহায্যে ৩-৪ বার জমি চাষ, নিড়ানির সাহায্যে আগাছা দমন) তুলনায় ১৪% ফলন (ধান সমতুল্য ফলন) বাড়ে, চাষাবাদের খরচ ১২% কম হয় এবং হেক্টর প্রতি বছরে ১৯,২৪৪ টাকা বেশী আয় করা সম্ভব হয়। এ ছাড়া জমিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ ১৬% বৃদ্ধি পায় যার ফলে মাটির উর্বরতা রক্ষিত হয়।

প্রধান গবেষক: প্রফেসর ড. মোঃ জহির উদ্দিন, মৃত্তিকা বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ, মোবাইল: ০১৭১৮-৮১৩৮৮৯

১.১১ খাগড়াবিল জলবিভাজিকায় প্রযুক্তি প্রয়োগে অবকাঠামো বাঁধ নির্মাণ ও বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ করে সারা বছর ফসল উৎপাদন কৌশল

খাগড়াছড়ি জেলা পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের অর্ন্তগত যা পাহাড় ও বনভূমি দ্বারা বেষ্টিত। এখানে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ৩০০০ মিলিমিটারের বেশী। তবে এসব বৃষ্টিপাতের অধিকাংশই বর্ষা মৌসুমে হয়ে থাকে ফলে শুকনো মৌসুমে পানির তীব্র ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। এলাকায় যেসব ছোট জলাশয়, নদী, খাল ও পাহাড়ি ছড়া রয়েছে সেগুলো ফসল উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় পানি সরবরাহ করতে পারে না। তবে আশার বিষয় পাহাড়ি ছড়ায় ছোট ছোট বাঁধ নির্মাণ করে মৌসুমী বৃষ্টিপাত সংরক্ষণ করে পাহাড়ের চূড়ায় ও ঢালুভূমিতে পাম্পের মাধ্যমে এবং সমভূমিতে পানি প্রবাহ দ্বারা বিনা শক্তিতে সেচের ব্যবস্থা করে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির সুযোগ রয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে পাহাড়ি এলাকায় প্রতিনিয়ত চাষাবাদ পদ্ধতির পরিবর্তন হচ্ছে, ফলে টেকসই কৃষি উৎপাদনের মাধ্যমে মানুষের জীবনমান ও জীবিকা উন্নয়নে পাহাড়ি এলাকায় জলবিভাজিকা (watershed) ও সেচ ব্যবস্থা উন্নয়ন বিষয়ে গবেষণাকার্য পরিচালনা করা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন এর অর্থায়নে একটি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। গবেষণার

প্রধান উদ্দেশ্যে হল সম্ভাব্য জলবিভাজিকা এলাকাগুলোতে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে অবকাঠামো বা বাঁধ (dam) নির্মাণের জন্য উপযুক্ত স্থান নির্বাচন এবং এর নির্মাণসহ ব্যবস্থাপনার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এখানে খাগড়াবিল জলবিভাজিকায় অবকাঠামো (structure) নির্মাণ ও বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ করে সারাবছর ফসল উৎপাদন কৌশল বর্ণনা করা হলো। উল্লেখ্য যে, দেশের পাহাড়ি এলাকায় এই প্রথমবারের মত রিমোটসেন্সিং ও জিআইএস প্রযুক্তি পূর্ণব্যবহার করে স্থানভিত্তিক (location-based) এলাকা ডেলিনিয়েশন (delineation) ও জলবিভাজিকা এলাকার স্ববৈশিষ্ট্য নিরূপন এবং স্থানীয় কৃষক ও সকল পক্ষের (stakeholder) মতামতের ভিত্তিতে বাঁধ নির্মাণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

খাগড়াবিল জলবিভাজিকার অবস্থান

খাগড়াবিল জলবিভাজিকা এলাকাটি চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি সীমান্তবর্তী এবং খাগড়াছড়ি জেলার রামগড় উপজেলার পশ্চিম পাশে রামগড় ইউনিয়ন ও মৌজার মধ্যে অবস্থিত। এটি ২২০ ৫৪ ৪৬.৫১´ ও ২২০ ৫৬ ১৭.০৫´ উত্তর অক্ষাংশে এবং ৯১০ ৪৫ ৫৬.২৫´ ও ৯১০ ৪৫ ৫৭.১৪´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে রয়েছে। জলবিভাজিকাটির আয়তন ৯৮৩ হেক্টর এবং পরিধি ১২.১ কিলোমিটার। এর বেশির ভাগই নীচুপাহাড় যার চূড়াগুলো প্রায় সমতল থেকে সামান্য ঢালু, মধ্য ও নিম্নভাগ সামান্য ঢালুথেকে অধিক খাড়া এবং বেশ কিছু এলাকায় সমতল উঁচু ভূমি রয়েছে। পাহাড়গুলো উত্তর-দক্ষিণে লম্বালম্বিভাবে বিস্তৃত।

রিমোটসেন্সিং ও জিআইএস প্রযুক্তি প্রয়োগ এবং বাঁধ নির্মাণ কৌশল

- স্থানীয় কৃষক ও সকল পক্ষের সাথে পরামর্শ ও মাঠ পরিদর্শনের মাধ্যমে জলবিভাজিকা এলাকা নির্বাচন এবং প্রাথমিকভাবে বাঁধের স্থান চিহ্নিতকরণ।
- জলবিভাজিকা এলাকার ফসল উৎপাদনের প্রকৃত তথ্য এবং সংশ্লিষ্ট সমস্যাসমূহ ও উন্নয়ন সম্ভাবনার আলোকে কৃষকের আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য একটি প্রশ্নপত্র জরিপকরণ।
- অবকাঠামো (বাঁধ) নির্মাণের স্থান প্রস্তাবের জন্য রিমোটসেন্সিং ও জিআইএস প্রযুক্তি ব্যবহার করে সম্ভাব্য পানি প্রবাহ এলাকা ডেলিনিয়েশন ও মানচিত্র প্রণয়ন।
- আকাশচিত্র ব্যবহার করে জলবিভাজিকা এলাকার মাটি ও ভূমিরূপ, পাহাড়ের ঢালুত্ব ও ভূমিক্ষয় এবং ভূমি ব্যবহার সম্পর্কিত স্থান ভিত্তিক তথ্যসংগহ ও মানচিত্র প্রণয়ন।
- বর্ণিত সকল তথ্যের ভিত্তিতে বিশেষজ্ঞ, কেজিএফ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, স্থানীয় প্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্ট কৃষকদের সাথে পরামর্শ করে জলবিভাজিকা এলাকায় অবকাঠামোর স্থান চূড়ান্তকরণ।
- জলাধারের অবকাঠামোর নকশা প্রণয়ন ও নির্মাণ করা।
- পাহাড়ের ঢাল (slope) ও ফসলী জমিতে সেচ দেয়ার জন্য পাহাড়ের উঁচুস্থানে পানির ট্যাঙ্ক স্থাপন করে জলাধার থেকে পানি উত্তোলন করা, এবং
- সুবিধাভোগী সকলের অংশগ্রহনে জলাধার ও অবকাঠামোর ব্যবস্থাপনা।

জলবিভাজিকা ডেলিনিয়েশন কি এবং কেন

পাহাড়ি ছড়াগুলোর উৎপত্তিস্থল পাহাড়ের উপরিভাগে এবং এগুলো নিম্ন দিকে প্রবাহিত হয়ে বড় নালা তৈরি করে যা পরবর্তীতে খাল/বিল বা নদীতে মিলিত হয়। এরূপ প্রধান ছড়ার কোন একটি স্থানে পানির প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করা হলে ঐ নিয়ন্ত্রিত পানি যতটুকুএলাকা থেকে নিষ্কাশিত হয় ঐ এলাকা বা সীমানা চিহ্নিতকরণ প্রক্রিয়াই হচ্ছে জলবিভাজিকা ডেলিনিয়েশন। জলবিভাজিকার পানি ব্যবস্থাপনার জন্য সঠিকভাবে এরূপ এলাকা বা সীমানা নিরূপন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ডিজিটাল এলিভেশন মডেল (DEM) ব্যবহার করে জিআইএস পদ্ধতিতে পাহাড়ের যেসব স্থানে অপ্রতুল যোগাযোগ ব্যবস্থা রয়েছে সেসব জায়গায় সংক্রিয়ভাবে পানি নিষ্কাশন/প্রবাহ এলাকা নিরূপন করা সম্ভব যা সহজেই মানচিত্রে প্রদর্শন করা যায়। পরবর্তীতে চিহ্নিত এলাকার মাটি, ফসল ও সংশ্লিষ্ট তথ্যসমূহ সংগ্রহ করে অবকাঠামোর জন্য সুবিধাজনক স্থান নির্বাচন করা যায়। এরূপ কাজে রিমোটসেন্সিং ও জিআইএস পদ্ধতির ব্যবহার সময় ও অর্থ উভয়েরই সাশ্রয় হয়ে থাকে।

জলবিভাজিকা এলাকা ডেলিনিয়েশন

ডিজিটাল এলিভেশন মডেল থেকে ডেলিনিয়েশন পদ্ধতিতে জলপ্রবাহের নালা/ছড়াসহ এলাকার একটি মানচিত্র প্রস্তুত করা হয়েছে (চিত্র-১)। এ থেকে পাহাড়গুলোর চূড়া, ঢালুস্থান ও পানির গতিপথের অবস্থা বুঝা যায়। জলবিভাজিকা এলাকার ছড়াগুলো পাহাড় থেকে উৎপত্তি হয়ে একটি জায়গায় এসে মিলিত হয়েছে। ছড়াগুলোর উৎপত্তিস্থল দক্ষিণ-পূর্ব থেকে উত্তর-পশ্চিমে লম্বালম্বিভাবে প্রবাহিত হয়ে পশ্চিমে ফেনী নদীতে মিলিত হয়েছে। জলবিভাজিকা এলাকার দুইটি প্রধান ছড়ার ক ও খ দু'টি বাঁধের স্থান চিহ্নিত করে দু'টি ওয়াটারশেড এলাকার মানচিত্র তৈরী করা হয়েছে যার আয়তন যথাক্রমে ৫৫৬ ও ৪২৭ হেক্টর এবং একত্রিতভাবে ৯৮৩ হেক্টর। জলবিভাজিকা এলাকায় আরও ছোট বড় ছড়া এসে প্রধান ছড়ার সাথে মিলিত হয়েছে। প্রধান ছড়া যথা ক ও খ এর দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ৩.৫২ ও ৩.২২ কিমি এবং ছড়ার উঁচু নীচু প্রান্তের উচ্চতার পার্থক্য ২০.১ ও ১৮.৬ মি.। সুতরাং, জলবিভাজিকা হিসাবে বর্ণিত বেশিরভাগ এলাকা সেচের আওতায় অন্তর্ভূক্ত করা যাবে। তবে এ থেকে সম্ভাব্য সর্বাধিক সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার জন্য ছড়ার বিভিন্ন স্থানে একাধিক বাঁধ নির্মাণ করা যেতে পারে।

চিত্র-১: জলপ্রবাহের মানচিত্রে প্রস্তাবিত অবকাঠামোর স্থান

জলবিভাজিকা বৈশিষ্ট্য

মৃত্তিকা ও ভূমিরূপ: খাগড়াবিল জলবিভাজিকাটি উত্তর ও পূর্বাঞ্চলীয় নীচুপাহাড় ও পাহাড়ের পাদদেশীয় ভূমি দ্বারা গঠিত। বেশীরভাগ পাহাড়ের মাটি বেলে দোআঁশ থেকে এটেল দোআঁশ প্রকৃতির। তবে পাদদেশের মাটি সাধারণত এটেল দোআঁশ প্রকৃতির। জলবিভাজিকা এলাকাটি মূলতঃ তিনভাগে বিভক্ত, যা তিনটি মানচিত্র এককে দেখানো হয়েছে (চিত্র-৩ক)। মানচিত্র একক১ এর মোট ৮৫৫ হেক্টর, জমির সম্পূর্ণটাই পাহাড়ের অর্ন্তগত। এর মাটির উর্বরতা শক্তি খুবই কম। মানচিত্র একক-২ ও ৩ এলাকার আয়তন যথাক্রমে ৫৩ ও ৬৮ হেক্টর যা সরু ও প্রশস্ত উপত্যকার অর্ন্তগত। এগুলোর মাটি অপেক্ষাকৃত উর্বর।

ভূমির ঢাল শ্রেণি ও ভূমিক্ষয়: ভূমি ব্যবহার ও ভূমিক্ষয় পাহাড়ের ঢালুত্বের উপর নির্ভর করে। ভূমির ঢালুত্ব যত বেশি, মৃত্তিকা ক্ষয়ও তত বেশি হয়। জলবিভাজিকার পাহাড়গুলোর উপরিভাগ সামান্য ঢালুহলেও মধ্যভাগ ও নীচের অংশ খুব খাড়া। ভূমির ঢাল শ্রেণি ও ভূমিক্ষয় মানচিত্র অনুযায়ী (চিত্র-৩খ ও ৩গ) জলবিভাজিকার বেশির ভাগ অর্থাৎ শতকরা ৪০.৭ ভাগ পাহাড় মাঝারি ঢাল বিশিষ্ট (১৫-৩০%)। এসব ঢালে মাঝারি থেকে অধিক মাত্রার মৃত্তিকা ক্ষয়ের সম্ভাবনা রয়েছে। তাছাড়া উল্লেখযোগ্য এলাকা (শতকরা ৩৪.৫ ভাগ) অধিক বা অত্যধিক মৃত্তিকা ক্ষয়ের আশংকাযুক্ত খাড়া থেকে অধিক খাড়া ঢালের (>৩০%) পাহাড় রয়েছে। প্রায় সমতল থেকে মৃদু ঢালু (০-১৫%) ভূমির পরিমান শতকরা ২৪.৮ ভাগ, যা পাহাড়ের পাদদেশ বা উপত্যকায় বিস্তৃত। এসব এলাকায় মাঝারি মাত্রার মৃত্তিকা ক্ষয় হয়ে থাকে।

ভূমি ব্যবহার: পাহাড়গুলোর শতকরা ৩১.৮ ভাগ ঘন বন, ৯.৮ ভাগ অনাচ্ছদিত ভূমি এবং ৪৫.৩ ভাগ বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকা বনভূমি রয়েছে যার কিছুঅংশে সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত ফলবাগান করা হয়েছে (চিত্র-৩ঘ)। তাছাড়া কিছুঅংশে উদ্যান ফসল, বাঁশ, গুল্ম ও ঝোপঝাড় রয়েছে। প্রশস্ত ও সরু উপত্যকাগুলোর পরিমাণ যথাক্রমে শতকরা ৬.৯ ও ৫.৪ ভাগ যা ফসলিজমি-১ ও ২ এর অর্ন্তগত। এসব এলাকা মাঠ ফসলের জন্য খুবই উপযোগী, ফলে সেচের মাধ্যমে জলাধারে সংরক্ষিত পানি ব্যবহার করে বছরে দুই বা ততোধিক ফসল উৎপাদন সম্ভব হবে। এছাড়া ৭ হেক্টর বসতবাড়ি প্রধানতঃ উত্তর অঞ্চলের উপত্যকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

জলবিভাজিকা বাঁধের স্থান চূড়ান্তকরণ

জলবিভাজিকা এলাকায় ফোকস গ্রুপ আলোচনা (FGD), সকল পক্ষের সাথে পরামর্শ, মাঠ জরিপ ও এলাকা ডেলিনিয়েশনের এর ভিত্তিতে জলবিভাজিকার কাঠামোর (বাঁধ) স্থান চিহ্নিত করে দুইটি ওয়াটারশেড এলাকা প্রস্তাব করা

হয়। পরবর্তীতে এলাকার ভূমিরূপ, পাহাড়ের ঢালুত্ব ও মাটির প্রকার এবং ভূমি ব্যবহার ও পানি প্রবাহ বিবেচনা করে দুটি জলবিভাজিকা এলাকার যে কোন একটিতে অবকাঠামো নির্মাণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এরপর বিশেষজ্ঞ, কেজিএফ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও স্থানীয় প্রতিনিধি এবং সংশ্লিষ্ট কৃষকদের পরামর্শের ভিত্তিতে স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং পদ্ধতি অনুসরণ করে পূর্বে ডেলিনিয়েশনকৃত দুটি জলবিভাজিকা এলাকাকে একত্রিভূত করে একটি স্থানে অবকাঠামো (বাঁধ) নির্মাণের জন্য চূড়ান্ত করা হয়।

চিত্র-২: খাগড়াবিল জলবিভাজিকার অরকাঠামো (বাঁধ) ও জলধার

জলবিভাজিকার বাঁধের বিবরণ

মাঠ জরিপের ফলাফল এবং জলবিভাজিকা ডেলিনিয়েশন ও বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে ২০১৯ সালে খাগড়াবিল জলবিভাজিকার অবকাঠামো (বাঁধ) নির্মাণ করা হয় যার বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো:

- পানি ধারন ক্ষমতা : ১৮০০০ কিউবিক মিটার , জলবিভাজিকার ক্ষেত্রফল : ৯৮৩ হেক্টর
- সমভূমির পরিমাণ : ১২১ হেক্টও, বাঁধের গভীরতা : ৩.৫ মিটার , বাঁধের দৈর্ঘ্য : ১৭ মিটার

জলবিভাজিকার মাটি সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য সুপারিশসমূহ

- জুম চাষে বা খাড়া থেকে অধিক খাড়া পাহাড়ি ঢালে ফসল উৎপাদনে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।
- পাহাড়ের হালকা ও মাঝারি ঢালে ফলের গাছ (যেমন কাঁঠাল, আম, লিচু, বাতাবী লেবু, মাল্টা ও পেয়ারা) এবং দ্রুত বর্ধনশীল জ্বালানি গাছ লাগানো যেতে পারে। সম্ভব হলে চা ও কফির বাগান প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে।
- পাহাড়ের মাটি যথাসম্ভব ন্যূনতম সময়ের জন্য অনাচ্ছাদিত রাখা উচিত। আচ্ছাদন জাতীয় শস্যের আবাদের মাধ্যমে বাগানে রোপন এবং বাড়ন্ত পর্যায়ের চারা গাছের বৃদ্ধি নিশ্চিত করতে হবে। প্রয়োজনে আগাছাসমূহ কেটে মাটি ঢেকে দিতে হবে যাতে মাটিতে রস সংরক্ষিত থাকে।
- যেখানে উপযুক্ত সেখানেই বিভিন্ন প্রকারের সোপান (terrace) তৈরি করা যেতে পারে। রাস্তা বা পায়ে হাঁটার পথ পাহাড়ের চূড়া বা কন্টুর অনুসরণে তৈরী করা উচিত।

নির্মিত জলবিভাজিকার ভবিষ্যত সম্ভাবনা

- জলবিভাজিকার জলাধার থেকে পাম্পের মাধ্যমে পানি উত্তোলন করে পাহাড়ের ঢালুভূমিতে উদ্যান ফসলের ব্যাপক চাষ সম্ভব হবে।
- জলবিভাজিকা এলাকায় বানিজ্যিকভাবে নিবিড় ও বিস্তৃত চাষাবাদের মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন ও ফলন বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
- এতে উচ্চফলনশীল শস্যের সাথে বহুমুখী বৃক্ষ চাষের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

চিত্র-৩: জলবিভাজিকায় বিভিন্ন ফসলের প্রদর্শনী

- জলবিভাজিকার জলাধারের পানির বহুমুখী ব্যবহার বিশেষতঃ পারিবারিক জলের চাহিদা মেটানো সম্ভব হবে।

- নতুন উচ্চমূল্যের (কফি, কাজুবাদাম ও মসলা জাতীয়) ফসল আবাদ সম্ভব হবে।
- একমাত্র বৃষ্টি নির্ভর ফসল উৎপাদনের উপর নির্ভরতা হ্রাস পাবে। এছাড়া ফসলের ফলন ও মান বৃদ্ধি পাবে।
- এলাকায় কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে।
- গ্রামীন উন্নয়নে মহিলাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে
- চিত্র-৫: জলবিভাজিকায় বিভিন্ন ফসলের প্রদর্শনী

প্রধান গবেষক: ড. মুন্সী রাশীদ আহ্‌মদ, সিএসও, পাহাড়ি কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, বারি, খাগড়াছড়ি পার্বত্যজেলা, ই-মেইল: cso_hars@yahoo.com, মোবাইল: ০১৫৫২৩৪৬৯০৩।

১.১২ পাহাড়ি এলাকায় উন্নত প্রযুক্তিতে জুম চাষ ব্যবস্থাপনা

পাহাড়ের ঢালে জুম ফসলের জমিতে একজন জুমিয়া চাষী

জুম চাষ পাহাড়ি এলাকায় প্রচলিত এক ধরনের কৃষিপদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে পাহাড়ের ঢালে জঙ্গল কেটে পুড়িয়ে চাষ করা হয়, আবার সেই স্থানে জমির উর্বরতা কমে গেলে অন্যত্র জুমের জমি গড়ে ওঠে। জুমিয়া চাষিগণ পৌষ-মাঘ মাসে পাহাড়ের ঢালে জঙ্গল কেটে পরিস্কার করে রৌদ্রে শুকানোর পর ফাল্গুন-চৈত্র মাসে আগুনে পুড়িয়ে জমি জুম চাষের উপযোগী করে তোলেন। এরপর বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে মাটিতে সুঁচালো দা দিয়ে গর্ত খুঁড়ে একত্রে ধান, তুলা, তিল, মরিচ, ভুট্টা, মারফা ছাড়াও অনেক ফসলের বীজ বপন করা হয়। জুমের ধান আষাঢ়-শ্রাবণে পাকে। এরপর মারফা, মরিচ, চিনার, ভুট্টা ও সবশেষে তুলা, তিল, যব ঘরে তোলা হয় কার্তিক-অগ্রহায়ণে। জুমিয়ারা সাধারণত ককরো, গেলেং, বিন্নি এসব জাতের ধান চাষ করেন। এছাড়াও কিছু আধুনিক ধানের জাত বিশেষ করে ব্রি ধান২৪, ব্রি ধান২৬, ব্রি ধান২৭ ও ব্রি ধান৫৫ জুমের জমিতে ভাল ফলন দেয় । ফলে, স্থানীয় জাতের ধানের চেয়ে আধুনিক ধানের চাষে আগ্রহ বাড়ছে জুম কৃষকদের। পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলায় ৫০ হাজার হেক্টর জুম চাষের উপযোগী জমি রয়েছে। কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে এসব জমিতে উন্নত পদ্ধতিতে জুম চাষ বিষয়ে গবেষণা করা হয়েছে এবং ফলাফল দেখে স্থানীয় জুম চাষিদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে।

জুমের জমিতে ডিবলিং করে বীজ বোনা/সার দেওয়া

উদ্ভাবিত/নির্বাচিত প্রযুক্তির বর্ণনা

জুম চাষে বীজ বপন

জুম চাষের জন্য নির্বাচিত পাহাড়ের গায়ে শীতের শেষের দিক থেকেই জঙ্গল কাটা শুরু করতে হবে। কাটা জংগল চৈত্র মাসের মধ্যেই পুরোপুরি শুকিয়ে ফেলতে হবে। শুকানোর পর এই জঙ্গল ভালভাবে পুড়িয়ে দিতে হবে। আগাছা ও অবশিষ্ট জংগল পরিষ্কার করে বীজ বোনার জন্য প্রস্তুত করতে হবে। বৈশাখ (মধ্য এপ্রিল থেকে মধ্য মে) মাস জুম বীজ বোনার উপযুক্ত সময়। প্রচলিত জুম চাষে ধান ও অন্যান্য ফসলের ৫/৭টি বা তারও বেশি শস্যের বীজ একত্রে মিশিয়ে বোনা হয়। বৈশাখ মাসে বৃষ্টির সাথে সাথে ধান ও অন্যান্য ফসলের বীজ মিশিয়ে দা দিয়ে মাটিতে কিঞ্চিৎ গর্ত করে মিশ্রিত বীজ বুনতে হয়। জুম বীজ সারিতে বুনলে ভাল হয়। পাহাড়ের

ঢালে আড়াআড়ি সারিতে বীজ বুনতে হয়। সারি থেকে সারির দূরত্ব ৬০ সেমি এবং গর্ত থেকে গর্তের দূরত্ব রাখতে হবে ৩০ সেমি। পাহাড়ের আড়াআড়ি উল্লেখিত দূরত্বে দা দিয়ে গর্ত করে তার ভিতর বীজ দিতে হবে। এর পর মাটি দিয়ে বীজ ঢেকে দিতে হবে। উল্লেখিত গর্তের গভীরতা হবে ২.৫-৩ সেমি। মিশ্র সার প্রয়োগ করতে হবে।

সার প্রয়োগ পদ্ধতি

ভাল ফলনের জন্য সুষম সারের প্রয়োজন। সারের পরিমাণ যথাক্রমে ১৩০, ১০০, ৬০, ৬০ কেজি/হে. ইউরিয়া, টিএসপি, এমপি, জিপসাম।সার প্রয়োগ করতে হবে ডিব্লিং পদ্ধতিতে অর্থাৎ মাটিতে গর্ত করে তার ভিতরে সার দিতে হবে। সার তিন কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। বীজ বোনার আগে ১/৪ ইউরিয়া + টিএসপি + ১/২ এমওপি + জিপসাম, ৩৫ দিন পর ১/৪ ইউরিয়া + ১/২ এমওপি এবং বীজ বোনার ৫৫ দিন পর ১/৪ ইফরিয়া।

জুম ফসল রক্ষায় আইপিএম পদ্ধতিতে পোকা দমন

জুম চাষে আগাছা ও পোকামাকড় দমন ব্যবস্থাপনা

- জঙ্গল পোড়ানোর পরে বীজ বোনার ২-৩ দিন আগে স্প্রে মেশিন দিয়ে সম্পূর্ণ জমিতে ভালভাবে ওষুধ ছিটাতে হবে।
- বীজ বোনার পর ওষুধ ছিটানো যাবে না।
- পাহাড়ে আগাছা কাটার পর অবশ্যই আগুন দিয়ে পোড়াতে হবে।
- বীজ বোনার আগে জমিতে আগাছানাশক প্রয়োগ করতে হবে।
- জমির আগাছা গজানোর পরে হাত দিয়ে পরিষ্কার করে অন্য কোথাও রেখে রৌদ্রে শুকিয়ে নিতে হবে।
- শুকনো আগাছা অথবা খড়কুটো দিয়ে গাছের গোড়ায় মালচিং করতে হবে।
- জুমে স্প্রে মেশিন দিয়ে গাছে ভালভাবে কীটনাশক ছিটাতে হবে।
- মোটামুটি ৩-৪ বার কীটনাশক স্প্রে করা যেতে পারে।
- তবে গাছে ফুল আসার পর্যায়ে কিছুদিন স্প্রে বন্ধ রাখতে হবে।

জুমে পোকামাকড় দমনে আইপিএম (নাপ্পি ফাঁদ+পাচিং+ভলিয়াম ফ্লেক্সি ৩০০ এসসি) পদ্ধতি ব্যবহার পরিবেশের জন্য উত্তম।

জুম চাষে সমন্বিত শস্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

- বীজের আর্দ্রতা শতকরা ১২ ভাগের নীচে থাকতে হবে।
- বীজ রাখার পাত্র ভালভাবে পরিষ্কার করে শুকিয়ে নিতে হবে।
- বীজ রাখার জন্য ধাতব পাত্র, মাটির মটকা বা কলস, তেলের ড্রাম, টিন, মোটা পলিথিনের থলি ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে ।
- পাত্রটি সর্ম্পূন বীজ দিয়ে ভরাট করে রাখতে হবে।
- পাত্রের মুখ ভালভাবে বন্ধ করে মাটি থেকে কিছুটা উপরে রাখতে হবে।
- বীজ সংরক্ষণের জন্য পাত্রের মুখে শুকনো নিম পাতা বা বিষকাটালী দিয়ে রাখা যেতে পারে ।
- সংরক্ষণ করা বীজ মাঝে মাঝে পরীক্ষা করে দেখতে হবে যাতে পোকামাকড় বা ইঁদুর ক্ষতি করতে না পারে।

এই প্রযুক্তি ব্যবহারে খরচ ও লাভের পরিমাণ

আধুনিক পদ্ধতিতে জুমচাষ করলে অধিক ফলন পাওয়া যায় এবং পাহাড়ি চাষিরা অধিক লাভবান হন। জুমচাষে খরচ হয় হেক্টরপ্রতি ৭৫,২৫০টাকা আর হেক্টরপ্রতি উৎপাদিত ফসলের দাম ২,০৮,৫৩২ টাকা, ফলে প্রতি হেক্টরে লাভ ১,৩৩,২৮২ টাকা। লাভ খরচের অনুপাত ২.৭৭।

প্রধান গবেষক: প্রফেসর ড. মোঃ এজেএম সিরাজুল করিম, মৃত্তিকা বিভাগ, বঙ্গবন্ধু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সালনা, গাজীপুর, মোবাইল: ০১৫৫২-৬০১০৭০

১.১৩ পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি ভূমিতে জুম চাষের পর মাটিতে থাকা রস দিয়ে বরবটি/ফেলন চাষ

জুম চাষ হচ্ছে একটি বৃষ্টিনির্ভর চাষাবাদ পদ্ধতি। জুম ফসল কাটার পর আশ্বিন ও কার্তিক মাসে জুম পাহাড় কিছু সময় পতিত থাকে। এ সময় জুম চাষিরা তেমন কিছু চাষ করেন না। কারণ এই সময় তেমন বৃষ্টি হয় না। কিন্তু বর্তমানে পাহাড়ি এলাকার আবহাওয়া কিছুটা পরিবর্তন হওয়ায় আশ্বিন ও কার্তিক (মধ্য সেপ্টেম্বর ও মধ্য নভেম্বর) মাসেও কিছু বৃষ্টিপাত হয়। জুম চাষে গুটি ও সাধারণ সার প্রয়োগ করা হয়ে থাকে এর ফলে সারের কিছুটা প্রভাব কয়েক মাস মাটিতে বজায় থাকে। জুম ফসলের পর মাটিতে জমে থাকা রস ও সারের অবশিষ্টাংশ ব্যবহার করে স্বল্পমেয়াদি ফসল বরবটি ও ফেলন লাভজনকভাবে চাষ করা যায়।

পাহাড়ী ভুমিতে জুম চাষ পরবর্তী ফেলন এবং বরবটি চাষ

প্রকল্পের মাধ্যমে উদ্ভাবিত/নির্বাচিত প্রযুক্তির বর্ণনা

জাত নির্বাচন: ফেলনের ক্ষেত্রে স্থানীয় জাত এবং বরবটি ক্ষেত্রে বারি বরবটি-১।

বপন পদ্ধতি: ফেলন ও বরবটি বীজ দুটোই ডিবলিং পদ্ধতিতে বপন করতে হবে। সারিতে বপন করলে সারি থেকে সারির দূরত্ব ৩০-৪০ সেমি, গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ১০ সেমি।

বপনের সময়: জুম ফসল কাটার পর আশ্বিন ও কার্তিক (মধ্য সেপ্টেম্বর ও মধ্য নভেম্বর) মাসে বপন করা হয়।

বীজের হার: ফেলন ৩০-৪০ কেজি/হে এবং বরবটি ২০-২৫ কেজি/হে।

সার ব্যবস্থাপনা: জুম চাষের ফসলের জন্য দেওয়া সারের মাটিতে থেকে যাওয়া অবশিষ্ট অংশের প্রভাবে ফেলন ও বরবটি বাড়তে থাকে, তবে প্রয়োজনে কিছু টিএসপি ও পটাশ সার প্রয়োগ করা যেতে পারে।

পাহাড়ী ভুমিতে জুম চাষ পরবর্তী ফেলন এবং বরবটি চাষে সারিতে বীজ ডিবলিং

ফসলের পরিচর্যা: বীজ বপনের ৩০-৩৫ দিনের মধ্যে একবার আগাছা দমন করা প্রয়োজন। সেচের প্রয়োজন হয় না, তবে পরিমাণমত বৃষ্টি পেলে ফসলের জন্য ভালো।

ফসল কাটা: পৌষ ও মাঘ (মধ্য ডিসেম্বর - মধ্য ফেব্রুয়ারী) মাসের মধ্যেই ফেলন ও বরবটি ফসল কাটার উপযুক্ত হয়ে যায়।

ফলন: ফেলন ১৮০-২০০ কেজি/আড়ি (১৬০০ বর্গমি.) এবং বরবটি ১৬০-১৭৫ কেজি/আড়ি।

এই প্রযুক্তি ব্যবহারে খরচ ও লাভের পরিমাণ

প্রকল্পের সহযোগিতায় জুম চাষীরা পরবর্তী নতুন ফসল চাষাবাদের ফলে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি সম্ভব হয়েছে।

প্রধান গবেষক: প্রফেসর ড. আলোক কুমার পল, মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ, শেরে-ই-বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, মোবাইল: ০১৭১৫২১৩০৮৩, ই-মেইল:

১.১৪ পাহাড়ি জমিতে বছর জুড়ে জুম চাষে নাইট্রোজেন-ফসফরাস-পটাশিয়াম গুটি সারের ব্যবহার

পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ে জুম চাষ

বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম চাষ করা হয়। স্থানীয় জুমিয়া পরিবারগুলি সাধারণত ৩-৫ বছর একটি পাহাড় পতিত রেখে নতুন পাহাড়ে জুম চাষ করে। জুম চাষের জমি পতিত থাকার ফলে উৎপাদন কমে যাচ্ছে, কিন্তু পাহাড়ের জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে উৎপাদন বৃদ্ধির তাগিদ বাড়ছে, সেই সাথে বাড়ছে পাহাড়ি জমি পতিত না রেখে চাষাবাদ চলমান রাখার প্রয়োজনীয়তা। প্রতি বছর জুম চাষ করতে হলে মাটির উর্বরতা বজায় রাখা খুবই জরুরি। জুম চাষের পাহাড়ের মাটিতে নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশিয়ামের পরিমাণ খবই কম। জুম চাষের পাহাড়গুলোর ঢাল বেশ খাড়া তাই মাটি ক্ষয় বেশি হয়, এর ফলে গাছের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানের ঘাটতি থাকে। এছাড়া, প্রাচীন পদ্ধতিতে সার প্রয়োগ করলেও তা মাটি ধরে রাখতে পারে খুবই কম সময়। কয়েক ধাপে সার প্রয়োগ করাও জুম চাষীদের জন্য অধিক পরিশ্রমের এবং মজুরিও বেশি লাগে। এমতাবস্থায়, সাধারণ দানা সারের পরবির্তে এনপিকে (নাইট্রোজেন-ফসফরাস-পটাশিয়াম) গুটি সার প্রয়োগ করা যেতে পারে, কারণ এনপিকে গুটি থেকে পুষ্টি উপাদান ধীরে ধীরে বের হয় ও লম্বা সময় জুড়ে গছের জন্য মজুদ থাকে। কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে এই প্রকল্পে জুম চাষে গুটি সার প্রয়োগ বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে।

উদ্ভাবিত প্রযুক্তির বর্ণনা

এলাকা: পার্বত্য অঞ্চল (খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান)।

জুম ফসলসমূহ: জুম চাষে বিভিন্ন ধরনের ফসল উৎপাদন করা হয়। ইহা এক ধরনের মিশ্র চাষ পদ্ধতি। বর্তমানে জুম আবাদে ধান বেশি জনপ্রিয়। জুমে ধানের পরিমাণ প্রায় ৮০-৯০%। অন্যান্য ফসলের মধ্যে মারফা, মরিচ, মিষ্টি কুমড়া, ভুট্টা, তিল, চাল কুমড়া, ঢেঁড়শ, করলা উল্লেখযোগ্য।

জুম ফসলের জাত নির্বাচন: জুম চাষিগণ সাধারণত স্থানীয় জাত চাষাবাদ করে থাকেন। জুম ধানের ক্ষেত্রে ময়মনসিংহ ও কক্রো জাত উল্লেখযোগ্য।

চাষাবাদ পদ্ধতি

- **জঙ্গল কাটা ও পরিষ্কার:** ফাল্গুন-চৈত্র (মধ্য ফেব্রুয়ারি - মধ্য এপ্রিল) মাসে জঙ্গল পরিষ্কার করতে হয় এবং পোড়ানোর কয়েকদিন পরে বীজ বপন করতে হয়।

- **বীজ বপন:** বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠের (মধ্য এপ্রিল-মধ্য জুন) এর মধ্যে জুম ফসল সমূহের বীজ ডিবলিং পদ্ধতিতে বপন করা হয়। জুম ধান, মারফা, তিল, মরিচ ইত্যাদি ফসলের বীজ একটি থ্রুংয়ে (ঝুড়ি) নিয়ে পরিমাণমত দূরত্ব বজায় রেখে দা দিয়ে গর্ত করে ডিবলিং পদ্ধতিতে বীজ বপন করা হয়। জুমের ফসলগুলির মেয়াদকাল ১১০-১৩০ দিন। জুম ধানের মেয়াদকাল ১০৫-১২৫ দিন।
- **বীজের হার:** ৬২ কেজি/হেক্টর বা ১০ কেজি/আড়ি (১ আড়ি = ১৬০০ বর্গ মিঃ)।
- **রোপণের দূরত্ব:** ১০-১৫ সেমি

সার ব্যবস্থাপনা

এনপিকে গুটি: এনপিকে গুটি হলো ইউরিয়া, টিএসপি ও পটাশ সারের মিশ্রন, যা মাটিতে ধীরে ধীরে মিশে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে ও ফসলের প্রয়োজনী পুষ্টি সরবরাহ করে। এতে করে সারের সঠিক ব্যবহার হয়। একটি গুটির ওজন ১.৮-২.৮ গ্রাম পর্যন্ত হয়।

সারের মাত্রা: ইউরিয়া ১০৮, টিএসপি ৯০, পটাশ ৬০ কেজি ও জিপসাম ৬৬ কেজি/হেক্টর।

সার প্রয়োগ পদ্ধতি: জুম ফসলের চারার বয়স ১২-১৫ দিন হলে এনপিকে গুটি সার ডিবলিং পদ্ধতিতে চারটি গুছির মাঝখানে একটি অথবা দু'টি করে মাটির ভিতর পুঁতে দিতে হয়।

এনপিকে গুটি সার (উপরে) ও গুটি সার মাটিতে পুঁতে দেওয়া (নীচে)

পোকামাকড় ব্যবস্থাপনা

জুম চাষের ফসলগুলি স্থানীয় জাত এবং পোকামাকড় সহনশীল। তবে যদি প্রকোপ দেখা দেয় সেক্ষেত্রে এসিমিক্স নামে কীটনাশক ব্যবহার করা যায়।

রোগ ব্যবস্থাপনা

- জুমের বেশির ভাগ ফসলই রোগ প্রতিরোধী।
- সুষম মাত্রায় (এনপিকে গুটি) সার ব্যাবহার করার ফলে রোগের প্রকোপ কম হয়।
- ফসলে রোগ দেখা দিলে টিল্ট ২৫০ ইসি ০.৫ মিলি লিটার ১ লিটার পানির সাথে মিশিয়ে ব্যবহার করা যেতে পারে।

ফসল কাটা

শ্রাবন-আশ্বিন (মধ্য আগস্ট - মধ্য অক্টোবর) তারিখের মধ্যে জুমের ধান কাটা হয়। যেহেতু জুমে অনেকগুলো ফসল থাকে তাই যেটা আগে সংগ্রহের উপযোগী হয় সেটা আগেই সংগ্রহ করা হয়।

এই প্রযুক্তি ব্যবহারে খরচ ও লাভের পরিমাণ

সাধারণ সারের পাশাপাশি এনপিকে গুটি সার প্রয়োগের মাধ্যমে জুমের ফলন বৃদ্ধি পায় কয়েক গুণ। এনপিকে গুটি সার প্রয়োগের মাধ্যমে জুম ধানের ফলন বৃদ্ধি পায় গড়ে ৩.৮-৪.১ টন/হেঃ। এছাড়া মারফা ৮০০-৯০০ কেজি/হেঃ, ভুট্টা ৪৫০-৫০০ কেজি/হেঃ, মিষ্টি কুমড়া ৮০০-১১০০ কেজি/হেঃ, তিল ১২০-

জুম চাষের ধান কাটা এবং অন্যান্য ফসল সংগ্রহ

২০০ কেজি/হেঃ, মরিচ ১১৫-১৮০ কেজি/হেঃ। জুম চাষে উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের পাহাড়ি জনগোষ্ঠির আয় বাড়বে, তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে।

প্রধান গবেষক: প্রফেসর ড. আলোক কুমার পল, মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ, শেরে-ই-বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, মোবাইল: ০১৭১৫২১৩০৮৩, ই-মেইল:

১.১৫ সার প্রয়োগের মাধ্যমে একই জমিতে প্রতি বছর জুম চাষ

জুম চাষ পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি এলাকায় প্রচলিত এক ধরনের কৃষি পদ্ধতি। জুম পদ্ধতিতে জঙ্গল কেটে পুড়িয়ে চাষ করা হয়। তারপর সেই স্থানে জমির উর্বরতা কমে গেলে সেখান থেকে সরে গিয়ে পাহাড়ের অন্যত্র নতুন করে একইভাবে জুম চাষ শুরু হয়। সাধারণত মাটির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য ৩-৫ বছর জুম পাহাড় পতিত রেখে অন্য স্থানে গিয়ে জুম চাষ করা হয়। কিন্তু বাংলাদেশে দিন দিন জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, এতে করে জুমের পাহাড় পতিত রেখে নতুন জুম চাষের সুযোগ কমে যাচ্ছে। সুতরাং এমতাবস্থায় মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি এবং জুমের ফলন বৃদ্ধির জন্য সার প্রয়োগের মাধ্যমে প্রতি বছর একই স্থানে জুম চাষ একটি যথাযথ বিকল্প হতে পারে। কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে এই প্রকল্পে ছয় বছর জুম চাষিদের বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করে ধারাবাহিক জুম চাষে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ে জুম চাষ

প্রকল্পে উদ্ভাবিত প্রযুক্তির বর্ণনা

জুম ফসলসমূহ

জুম একটি মিশ্র চাষ পদ্ধতি যাতে এক সাথে নানা ফসল বোনা হয়। বর্তমানে জুমের ধানটাই বেশি জনপ্রিয়। জুমে ধানের পরিমান প্রায় ৮০-৯০%। অনন্যা ফসলের মধ্যে মারফা, মরিচ, মিষ্টি কুমড়া, ভুট্টা, তিল, চাল কুমড়া, ঢেঁড়শ, করলা উল্লেখযোগ্য।

জুম ফসলের জাতসমূহ নির্বাচনঃ জুম চাষীরা সাধারনত তাদের স্থানীয় জাতগুলিই চাষাবাদ করে থাকে। জুম ধানের ক্ষেত্রে ময়মনসিংহ ও কক্‌রো জাত উল্লেখযোগ্য।

চাষাবাদ পদ্ধতি

- ফাল্গুন-চৈত্র (মধ্য ফেব্রুয়ারি-মধ্য এপ্রিল) মাসে জঙ্গল পরিষ্কার করা হয় এবং পোড়ানোর কয়েকদিন পরে বীজ বপন করা হয়।
- জুম ফসলের মেয়াদকাল ১১০-১৩০ দিন, তবে জুম ধানের মেয়াদকাল ১০৫-১২৫ দিন।
- বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠের (মধ্য এপ্রিল-মধ্য জুন) এর মধ্যে জুম ফসল সমূহের বীজ ডিবলিং পদ্ধতিতে বপন করা হয়। জুম ধান, মারফা, তিল, মরিচ ইত্যাদি ফসলের বীজ একটি থ্রংয়ে (ঝুড়ি) নিয়ে পরিমাণমত দুরত্ব বজায় রেখে দা দিয়ে গর্ত করে ডিবলিং পদ্ধতিতে বীজ বপন করা হয়। বীজের হারঃ ৬২ কেজি/হেক্টর।
- রোপনের দূরত্বঃ ১০-১৫ সেমি।

সার ব্যবস্থাপনা

সার প্রয়োগের মাধ্যমে একই জমিতে প্রতিবছর জুম চাষের ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট সারের মাত্রা ঠিক করা হয়, এর ফলে জুম ফসলের গড় উৎপাদন প্রত্যেক বছরই বৃদ্ধি পায়। সারের মাত্রাঃ ইউরিয়া ১৩০, টিএসপি ৯০, পটাশ ৬০ ও জিপসাম ৬৬ কেজি/হেক্টর। সার অবশ্যই ডিবলিং পদ্ধতিতে প্রয়োগ করতে হবে। সব সারই তিন ধাপে দেওয়া হয়।যথা, বীজ বপনের আগে প্রথম ধাপে ইউরিয়া ৪ ভাগের ১ ভাগ, এমওপি ২ ভাগের ১ ভাগ, জিপসাম পুরোটা দ্বিতীয় ধাপে (বীজ বপনের ৩০-৩৫ দিন পর) বাকি ইউরিয়া এমওপি এবং টিএসপি প্রয়োগ করা হয়। তৃতীয় ধাপে বীজ বপনের ৫০-৫৫ দিনে প্রয়োগ করা হয়।

আগাছা দমন

জুম চাষে যেহেতু বীজ বপনের আগে জঙ্গল পোড়ানো হয় সেহেতু তেমন আগাছার প্রকোপ দেখা যায় না তবে চারার বয়স ৩০-৩৫ দিন হলে কিছ কিছু আগাছা দেখা যায় সে ক্ষেত্রে আগাছনাশক যথা সানআফ অথবা দুরন্ত ব্যাবহার করা হয়।

জুম চাষের ফসলঃ ধান (উপরে) ও মিষ্টি কুমড়া (নীচে)

পোকামাকড় ব্যবস্থাপনা

জুম চাষের ফসলগুলি স্থানীয় জাতের এবং পোকামাকড় সহনশীল। তবে যদি প্রকোপ দেখা দেয় সেক্ষেত্রে এসিমিক্স নামে কীটনাশক ব্যাবহার করা যেতে পারে।

রোগ ব্যবস্থাপনা

- জুমের বেশির ভাগ ফসলই রোগ প্রতিরোধী।
- সুষম মাত্রায় সার ব্যাবহার করতে হবে।
- ফসলের রোগ দেখা দিলে ১লিটার পানিতে ০.৫ মিলি লিটার টিল্ট ২৫০ ইসি পানির সাথে মিশিয়ে ব্যবহার করা যেতে পারে।

ফসল কাটা

শ্রাবণ-আশ্বিন (মধ্য আগস্ট - মধ্য অক্টোবর) তারিখের মধ্যে জুমের ধান কাটা হয়। যেহেতু জুমে অনেকগুলো ফসল থাকে তাই যেটা আগে কাটার উপযোগী হয় সেটাই কাটা হয়।

এই প্রযুক্তি ব্যবহারে খরচ ও লাভের পরিমাণ

সার প্রয়োগের মাধ্যমে জুম চাষের ধানের ফলন বৃদ্ধি পেয়েছে গড়ে ৩.৫-৩.৬ টন/হেঃ। মারফা ৬০০-৭০০ কেজি/হেঃ, ভুট্টা ৩০০-৩৫০ কেজি/হেঃ, মিষ্টি কুমড়া ৫০০-৯০০ কেজি/হেঃ, তিল ১০০-১৫০ কেজি/হেঃ, মরিচ ৮০-১০০ কেজি/হেঃ। প্রতি বছর জুম চাষ করে পাহাড়ে ফসলের উৎপাদন বেড়ে যাওয়ার ফলে জুম চাষিরা অনেক বেশি লাভবান হচ্ছেন এবং তাঁদের জীবন যাত্রারও মান উন্নতি হচ্ছে।

প্রধান গবেষক: প্রফেসর ড. আলোক কুমার পল, মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ, শেরে-ই-বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, মোবাইল: ০১৭১৫২১৩০৮৩, ই-মেইল:

১.১৬ পাহাড়ি এলাকায় বসতবাড়ির আঙ্গিনায় বছরব্যাপি সবজির চাষ

পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার আয়তন ১৩,১৯১ বর্গ কি.মি. যা বাংলাদেশের প্রায় এক দশমাংশ। পাহাড়ি জনগণের মূল জীবিকা কৃষি, কিন্তু প্রযুক্তির অভাব, প্রযুক্তি সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব, টাকা পয়সার অভাব ইত্যাদি নানা কারণে ফসলের উৎপাদন এবং আয়ের পরিমাণ খুব কম। পাহাড়ি অঞ্চলে শাক-সবজির চাষ ও ফলন কম হওয়ার কারণে দাম বেশি এবং দৈনন্দিন খাবারে সবজির পরিমাণও খুব কম। অথচ একটু সচেতন হলেই বসত বাড়ির আঙ্গিনায় সবজি চাষ করে নিজের ও পরিবারের জন্য উন্নত পুষ্টির ও পারিবারিক আয় বাড়ানোর ব্যবস্থা করা সম্ভব। পার্বত্য চট্টগ্রামের অনেক এলাকায় এখনো চাষযোগ্য পতিত জমি পড়ে আছে, আবার আবাদী জমিতে ফসলের নিবিড়তা কম তাই ফসলক্রমে সহজেই সবজি অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগ আছে।

পাহাড়ী বসতবাটিতে সবজি চাষ

এছাড়াও পারিবারিক বাসস্থানের আঙ্গিনায় বছর জুড়ে সবজি উৎপাদন করা যায়। কিন্তু পাহাড়ী জনগণ সবজির ভাল জাত ও উন্নত উৎপাদন কলাকৌশল সম্পর্কে তেমন জানেন না, এবং তাঁরা সবজি খাওয়া তথা পুষ্টি সম্পর্কেও অমনোযোগী এবং সবজি চাষের মাধ্যমে যে আয় বাড়ানো যায় সে ব্যাপারেও তাঁদের ভালো ধারণা নেই। এ অঞ্চলে কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশনের (কেজিএফ) অর্থায়নে একটি গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট পার্বত্য অঞ্চলে "মডিফাইড খাগড়াছড়ি মডেল" অনুসরণ করে বছরব্যাপি সবজি চাষের সম্ভাবনা ও এর সুফল বিষয়ে কাজ করে।

উদ্ভাবিত/নির্বাচিত প্রযুক্তির বর্ণনা

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, হাটহাজারী বসতবাড়িটির আঙ্গিনায় সারা বছর সবজি উৎপাদনের জন্য "মডিফাইড খাগড়াছড়ি মডেল" উদ্ভাবন করে। এই মডেলে সাধারণত ৪ বেড পাশাপাশি তৈরি করে সারা বছর সবজি চাষ করা হয়। প্রতিটি বেডের প্রস্থ ১ মিটার, দৈর্ঘ্য ৪ মিটার ও দুই বেডের মধ্যবর্তী দুরত্ব ২৫ সেমি। বেডের দৈর্ঘ্য কৃষকের জমির পরিমাণের উপর নির্ভর করে সামান্য কম বেশি হতে পারে।

বেড়ায় সবজি আবাদ

করলা কার্তিকের ১ম সপ্তাহে বপন/রোপণ করা হয়। করলা তোলার সাথে সাথে পুরাতন মাদার পাশ দিয়ে সারি করে (৬০×৪০ সেমি) বরবটি বীজ বপন করতে হবে। বরবটি তোলার পর শ্রাবণ মাসে পুনরায় করলার বীজ বপন করতে হবে।

বরবটি (খরিপ)- শীম (রবি)

করলা (খরিপ)-লাউ (রবি)

	বেড ১	বেড-২	বেড-৩	বেড-৪
খরিপ-১	ডাটা শাক	মরিচ	পুঁইশাক	বেগুন
খরিপ-২	ঢেড়শ	মরিচ	পুঁইশাক	ঢেড়শ
রবি	এলা	লাল শাক	টমেটো	বেগুন + লাল শাক

বরবটি (খরিপ)- শীম (রবি)

করলা (খরিপ)-লাউ (রবি)

সবজি বিন্যাসের সংক্ষিপ্ত প্রযুক্তি বিবরণী প্রতি শতাংশে (৪০ বর্গ মিটার)

সবজি	সুপারিশকৃত জাত	রোপণ/ বপন কাল	বীজের পরিমাণ (গ্রাম)	বপণ/ রোপন দূরত্ব (সেমি)	সারের মাত্রা (গ্রাম)/শতাংশে		
					ইউরিয়া	টিএসপি	এমপি
মূলা	বারি মূলা-১	আশ্বিন থেকে ১৫ অগ্রহায়ন	১০	৩০ ×১৫	১৫০০	৭৫০	১০০০
লালশাক	বারি লালশাক-১	সারা বছর	৮	২০ × ক্রমা:	৮৮০	৪০০	৬০০
লাউ	বারি লাউ-৪	সারা বছর	১০	২ মাদা	৩৭.৫	৫৮.৩	৪৩
বরবটি	বারি বরবটি-১	গ্রীষ্মকাল	১০	১৮ × ১২	১২০০	৬০০	৮০০
টমেটো	বারি টমেটো-১৪ বারি টমেটো-১৫	শীত/- গ্রীষ্মকাল	১	৬০ × ৪০	১০০০	৭২০	৮০০
বেগুন	বারি বেগুন-৮		০.৫	৬০ × ৪০	১২০০	৮৮০	১০০০
ঢেঁড়স	বারি ঢেঁরস-১	গ্রীষ্মকাল	১৫-১৮	৫০ × ৪০	৫৬০	৪৮০	৪৪০
পুঁইশাক	বারি পুঁইশাক-১	গ্রীষ্মকাল	৮-১০	৩০ × ৩০	১১০০	৩২০	৩০০
ডাটা	বারি ডাটা-১	-	৪-৬	৩০	১০০০	৪০০	৬৪০
করলা	বারি করলা-১	-	২৫-৩০	২ মাদা	৩৭.৫	৫৮.৩	৪৩
মরিচ	পাহাড়ী মরিচ	গ্রীষ্মকাল	১০	৬০ × ৫০	১২০০	৮৮০	১০০০
শিম	বারি শিম-৬	শীতকাল	৩৫	২ মাদা	৩৭.৫	৫৮.৩	৪৩

সুস্থ সবল সবজির চারা উৎপাদন

<u>বীজ বপন ও পরিচর্যা</u>

- বীজতলায় সারি করে বা ছিটিয়ে বীজ বপন করা যায়, তবে সারিতে বপন করা উত্তম।
- সারিতে বপনের জন্য নির্দিষ্ট দূরত্বে (৪ সেমি) কাঠি বা টাইন দিয়ে ক্ষুদ্র নালা তৈরি করে তাতে বীজ ফেলে মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।
- ছোট বীজের বেলায় বীজের দ্বিগুণ পরিমাণ শুকনো ও পরিস্কার বালু বা মিহি মাটি বীজের সাথে ভালভাবে মিশিয়ে মাটিতে বীজ বপণ করতে হয়।
- শুকনো মাটিতে বীজ বপন করে সেচ দেয়া উচিত নয়। এতে মাটিতে চটা বেঁধে চারা গজাতে ও মাটির ভিতর বাতাস চলাচলে অসুবিধা সৃষ্টি করতে পারে। তাই সেচ দেয়া মাটির জো এলে বীজ বপন করতে হয়।

- যে সমস্ত বীজের আবরণ শক্ত, সহজে পানি প্রবেশ করে না, সেগুলোকে সাধারণতঃ বোনার পূর্বে পরিষ্কার পানিতে ১৫ থেকে ২০ ঘন্টা অথবা পানিতে শতকরা এক ভাগ পটাশিয়াম নাইট্রেট মিশিয়ে তাতে এক রাত ভিজিয়ে তারপর বপন করতে হয় (যেমন: লাউ, করলা ও বরবটি)।

সবজি চাষে বেড়ে বীজ বপন

- বৃষ্টির পানি ও অতিরিক্ত সূর্যতাপ থেকে রক্ষা করতে বীজতলা ঢেকে রাখার ব্যবস্থা থাকা দরকার। কম খরচে বাঁশের ফালি করে বীজতলার প্রস্থ বরাবর ৫০ সেমি পর পর পুঁতে নৌকার ছৈয়ের আকারে বৃষ্টির সময় পলিথিন দিয়ে এবং প্রখর রোদে চাটাই দিয়ে চারা রক্ষা করা যায়।

<u>চারার যত্ন</u>

- চারা গজানোর পর থেকে ১০-১২ দিন পর্যন্ত হালকা ছায়া দ্বারা অতিরিক্ত সূর্যতাপ থেকে চারা রক্ষা করা প্রয়োজন।
- সেচ গুরুত্বপূর্ণ তবে বীজতলার মাটি দীর্ঘ সময় ধরে ভেজা থাকলে অঙ্কুরিত চারা রোগাক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।
- চারার শেকড় যথেষ্ট বাড়ার পর রোদ কোন ক্ষতি করতে পারে না, তখন রোদ বরং উপকারী।
- চারা গজানোর ১০-১২ দিন পর বীজতলায় প্রয়োজন মত দূরত্ব ও পরিমাণে চারা রেখে অতিরিক্ত চারাগুলো যত্ন সহকারে উঠিয়ে দ্বিতীয় বীজতলায় সারি করে রোপন করলে মূল্যবান বীজ বাঁচবে।

দ্বিতীয় বীজতলায় চারা স্থানান্তর

- দেখা গেছে ১০-১২ দিনের চারা দ্বিতীয় বীজতলায় স্থানান্তরিত করা হলে কপি গোত্রের সবজি, বেগুন ও টমেটো চারার শিকড় বিস্তৃত ও শক্ত হয়, চারা অধিক সবল ও তেজি হয়।
- চারা উঠানোর আগে বীজতলায় পানি দিয়ে এরপর সূচালো কাঠি দিয়ে শিকড়সহ চারা উঠাতে হয়। উঠানো চারা সাথে সাথে দ্বিতীয় রোপণ করতে হয়।
- বাঁশের সূঁচালো কাঠি বা কাঠের তৈরি সূঁচালো ফ্রেম দ্বারা সরু গর্ত করে চারা গাছ লাগানো হয়।
- লাগানোর পর হালকা পানি দিতে হবে এবং বৃষ্টির পানি ও প্রখর রোদ থেকে রক্ষার জন্য পলিথিন বা চাটাই দ্বারা ঢেকে দিতে হবে।
- সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (আইপিএম) বিশেষত ফেরোমন ফাঁদ ও জৈব বালাই নাশক ব্যবহার করতে হবে।

এই প্রযুক্তি ব্যবহারে খরচ ও লাভের পরিমাণ

- একক জমিতে একই সময়ে অন্য ফসল উৎপাদনের চেয়ে সবজি ফসল চাষ লাভজনক এবং সবজি উৎপাদনে খরচের তুলনায় ২-৩ গুণ পর্যন্ত লাভ করা যায়।
- বছরজুড়ে সবজি চাষের ফলে স্থানীয় পর্যায়ে সবজির সরবরাহ বাড়বে ও খাদ্যের সাথে বেশি করে সবজি গ্রহণের ফলে পাহাড়ি জনগণের পুষ্টি নিরাপত্তা বাড়বে।

প্রধান গবেষক: ড. মোঃ আমিন, সাবেক মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, আরএআরএস, হাটহাজারী, বারি, চট্টগ্রাম।

১.১৭ পাহাড়ি এলাকায় বারি মাল্টা-১ চাষের আধুনিক কলাকৌশল

পাহাড়ী অঞ্চলে মাল্টা চাষ

বাংলাদেশে মাল্টা অন্যতম জনপ্রিয় ফল। খাদ্যগুণের দিক থেকে মাল্টা অতি সুস্বাদু ও পুষ্টি-সমৃদ্ধ খাবার। এতে পর্যাপ্ত পরিমানে ভিটামিন "সি" রয়েছে। বিশ্বের সর্বমোট উৎপাদিত সাইট্রাস ফলের মধ্যে দুই তৃতীয়াংশই হচ্ছে মাল্টা। বাংলাদেশেও এই ফলটির ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। পার্বত্য অঞ্চলের মাল্টার দেশব্যাপি বিশেষ কদর রয়েছে। এ অঞ্চলে কমবেশী সকল জায়গায় মাল্টার চাষ হয়। উচ্চ মূল্য, বাজারে যথেষ্ট চাহিদা থাকায় দিন দিন মাল্টার চাষ পার্বত্য অঞ্চলে বেড়েই চলেছে। বাংলাদেশের পাহাড়ি এলাকায় ব্যাপকভাবে মাল্টার চাষাবাদ করার সুযোগ আছে কারণ এই অঞ্চলের আবহাওয়া মাল্টা চাষের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। উন্নত ও আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে এর ফলন বহু গুণ বাড়ানো সম্ভব। পার্বত্য অঞ্চল ছাড়াও এদেশের সিলেট ও পঞ্চগড় জেলায় মাল্টার চাষ হয়। পাহাড়ি এলাকায় মাল্টার উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কেজিএফ এর অর্থায়নে পার্বত্য জেলায় বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক গবেষণা কার্যক্রম আরম্ভ করা হয় এবং নির্বাচিত মাল্টার জাতের সম্প্রসারণ কার্মকান্ড পরিচালিত হয়।

উদ্ভাবিত/নির্বাচিত প্রযুক্তির বর্ণনা

মাটি ও জলবায়ু

কম বৃষ্টিবহুল গ্রীষ্ম ও শীতকালে যথেষ্ট বৃষ্টিপাত হয় পানি সরে যায় এমন দো-আঁশ মাটি বা বেলে দো-আঁশ মাটি মাল্টা চাষের জন্য উত্তম। এটেঁল মাটির পানি নিষ্কাশন ক্ষমতা কম হওয়ায় এঁটেল মাটি মাল্টা চাষের জন্য ভাল নয়। প্রখর সূর্যকিরণ ও উচ্চ তাপমাত্রায় মাল্টা গাছের বৃদ্ধি ভালো হয় না, তাই অল্প ছায়াযুক্ত জায়গায় মাল্টার চাষ করতে হয়।

জমি তৈরি ও চারা রোপণ

পাহাড়ের জঙ্গল কেটে পরিষ্কার করে মাল্টার জন্য জমি প্রস্তুত করতে হবে। প্রতিটি চারা লাগাবার জন্য ৭৫ সেমি (১.৫ হাত) দৈর্ঘ্য, ৭৫ সেমি (১.৫ হাত) প্রস্থ এবং ৭৫ সেমি (১.৫ হাত) গভীর গর্ত করতে হবে। সার উপরের মাটির সংগে ভাল করে মিশিয়ে গর্তের নীচে এবং নীচের মাটি গর্তের উপরে দিয়ে ভরাট করে ৭-১০ দিন রেখে দিতে হবে। গর্তে অবশ্যই ১-২ কেজি চুন প্রয়োগ করতে হবে। সাধারণতঃ মধ্য-বৈশাখ থেকে মধ্য-ভাদ্র (মে থেকে আগস্ট) মাসের মধ্যে সুস্থ ও সতেজ ৮ মাস থেকে ১ বছর বয়সের মাল্টার চারা/কলম মাটির বলসহ গর্তের মাঝ বরাবর ৪ মি. x ৪ মি. (৮ হাত x ৮ হাত) দূরত্বে রোপণ করতে হবে। চারা রোপণের পর গাছের গোড়ার মাটি ভালভাবে চেপে দিয়ে হালকা পানি সেচ দিতে হবে। তারপর চারাটিকে একটি শক্ত খুঁটির সংগে বেঁধে দিতে হবে যেন বাতাসে হেলে না পড়ে। গরু-ছাগলের হাত থেকে রক্ষার জন্য বাঁশের তৈরি খাঁচা দিতে হবে।

পাহাড়ে সারিতে রোপন করা মাল্টা গাছ

সার ব্যবস্থাপনা

প্রতি বছর মধ্য ফাল্গুন থেকে মধ্য চৈত্র (মার্চ), বর্ষার পূর্বে মধ্য বৈশাখ থেকে মধ্য জ্যৈষ্ঠ (মে) এবং বর্ষার

পর মধ্য ভাদ্র থেকে মধ্য আশ্বিন (সেপ্টেম্বর) মাসে তিন কিস্তিতে সার প্রয়োগ করা যেতে পারে। তবে সেচের ব্যবস্থা না থাকলে বর্ষার আগে ও পরে দুই কিস্তিতে সার প্রয়োগ করা ভাল। পাহাড়ী ঢালু জমিতে গর্ত পদ্ধতিতে সার প্রয়োগ করতে হবে। গাছের বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে নিন্মের ছকে দেয়া পরিমাণ অনুযায়ী সার প্রয়োগ করতে হবে।

অন্যান্য পরিচর্যা

পাহাড়ি এলাকার জন্য বিন্দু পানি সেচ খুব কার্যকর ও সাশ্রয়ী। এ পদ্ধতিতে পাইপ দিয়ে পানি দেয়া হয়, প্রতিটি গাছের গোড়ায় পাইপে একটি ছিদ্র থাকে যার মাধ্যমে গাছের গোড়ায় পানি দেয়া যায়, পানি অত্যন্ত ধীরে ধীরে গাছের কাছাকাছি গড়িয়ে যায় ও শুধুমাত্র গাছের খুব নিকটবর্তী এলাকার মাটিই ভিজে। এ পদ্ধতিটি এমনভাবে তৈরি যার মাধ্যমে জমি বা গাছের পানির চাহিদা অনুসারে নির্দিষ্ট সময় অন্তর সেচ দেয়া ও বন্ধ করা যায়। বর্ষার সময় গাছের গোড়ায় যাতে পানি না জমে সে জন্য পানি তাড়াতাড়ি সরে যাওয়ার ব্যবস্থা রাখতে হবে। গাছের গোড়া সব সময়ই আগাছামুক্ত রাখতে হবে। বর্ষার শেষে সার প্রয়োগের পর গাছের গোড়া থেকে একটু দূরে বিভিন্ন লতাপাতা, খড়, কচুরীপানা ও শুকনা পাতা দিয়ে গাছের গোড়ার মাটি ৭.৫- ১০ সেমি পুরু করে ঢেকে গোল করে মাল্চ দিলে আগাছা দমনসহ শুকনা মৌসুমে মাটির রস ধরে রাখা যায়। জল-শোষক বের হলেই তা কেটে ফেলতে হবে। মরা, শুকনা ডালপালা মাঝে মাঝে ছাঁটাই করা উচিত।

মাল্টা গাছের পাতায় প্রজাপতির কীড়া

পোকামাকড় দমন

মাল্টা গাছে প্রধানত মাছি পোকা, প্রজাপতি, লিফ মাইনার, ছাতরা পোকা, গান্ধি পোকা ও লাল পিঁপড়ার আক্রমণ হয়। পূর্ণাঙ্গ স্ত্রী মাছি পোকা সাধারণতঃ আধা পাকা ফলের গায়ে ছিদ্র করে ডিম পাড়ে, ডিম পাড়ার ছিদ্র স্থানে ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া আক্রমণ করে ফল পচিয়ে ফেলে, আক্রান্ত ফল সহজেই ঝরে পড়ে। প্রজাপতি লেবু জাতীয় গাছের সর্বাধিক ক্ষতি করে থাকে। এ পোকার কীড়া পাতা খায় বিশেষ করে নার্সারীতে এবং ছোট গাছে এ পোকার আক্রমণ বেশি হয়, আক্রমণের মাত্রা বেশি হলে গাছ পাতাশূণ্য হয়ে যেতে পারে। মাইনার পোকার আক্রমণের মাত্রা তীব্র হলে গাছের পাতা কুকড়ে যায় ও ফ্যাকাশে হয়ে শুকিয়ে ঝরে পড়ে, আক্রান্ত পাতায় ক্যাঙ্কার রোগ হতে পারে। ছাতরা পোকা ও গান্ধি পোকা পাতা ও ফল থেকে রস চুষে খায় এবং এই পোকার রস থেকে স্যুটি মোল্ড নামক ছাতার জম্ম হয় যা গাছে পিঁপড়ার আক্রমণ বাড়ায়। লাল পিঁপড়া অনেকগুলো পাতা একত্র করে বাসা তৈরি করে, এসব বাসায় মিলিবাগ ও অন্যান্য পোকা বাস করে যার ফলে গাছে স্যুটি মোল্ড রোগ দেখা দেয়। মাল্টা গাছে পোকমাকড়ের আক্রমণ থেকে সুরক্ষার জন্য বিভিন্ন পোকার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। এ ব্যাপারে স্থানীয় কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানী বা কৃষি সম্প্রসারণ বিশেষজ্ঞগণের পরামর্শ গ্রহণ করা যেতে পারে। পোকামাকড় দমনের জন্য পোকার প্রকার ভেদে যেসব ব্যবস্থা নেওয়া যায় তা নীচে উল্লেখ করা হলো:

- আক্রমণের প্রথম দিকে পোকাসহ আক্রান্ত পাতা/কাণ্ড/ফল সংগ্রহ করে ধবংস করে ফেলতে হবে; আক্রান্ত গাছের ঝরে পড়া পাতা ও ফল কুড়িয়ে ধ্বংস করে ফেলতে হবে; ডিম ও কীড়াসহ পাতা সংগ্রহ করে ধ্বংস করতে হবে; গাছ থেকে পিঁপড়ার বাসা অপসারণ করতে হবে; বাগান সর্বদা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।
- বিষটোপ ফাঁদ (১০০ গ্রাম মিষ্টি কুমড়া/পাকা কলা + মিপসিন ৮৫ এস পি ০.২৫ গ্রাম) দ্বারা পূর্ণাঙ্গ মাছি দমন করা যেতে পারে।
- সেক্স ফেরোমোন (মিথাইল ইউজিনল) ফাঁদ ব্যবহার করে পুরুষ পোকা আকৃষ্ট করে দমন করা যায়।
- রিপকর্ড/মার্শাল/সিমবুশ (২ মিলি প্রতি লিটার পানিতে) ১৫ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করা যেতে পারে।
- প্রতি লিটার পানিতে ৫ গ্রাম সাবান পানি মিশিয়ে ৭-১০ দিন পর পর ৩-৪ বার স্প্রে করা যেতে পারে।

- সেভিন ৮৫ এসপি অথবা ডারসবান ২০ ইসি ২ মিলি প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে পিঁপড়ার বাসায় প্রয়োগ করা যেতে পারে।

রোগ ব্যবস্থাপনা

ক্যাংকার রোগের লক্ষণ

মাল্টা গাছের প্রধান রোগগুলো হচ্ছে গ্রিনিং, গামোসিস, ক্যাংকার ও ডাইব্যাক বা আগামরা। গ্রিনিং রোগের আক্রমণে গাছের পাতা হলদে ভাব ধারণ করে যা দেখতে অনেকটা দস্তার অভাব জনিত লক্ষণের ন্যায়। এর ফলে পাতার মধ্যশিরার এক পার্শ্বে হলুদ হয়ে যায়, পাতা কুঁকড়ে যায়, গাছ আগা থেকে নীচের দিকে মরতে থাকে। ফলে রস তেমন হয় না এবং স্বাদ কমে যায়। গামোসিস রোগের জীবাণু সাধারণতঃ গাছের শিকড় ও গোড়ার বাকল কেটে ক্ষতের সৃষ্টি হলে ক্ষতস্থানের ভিতর দিয়ে প্রবেশ করে; প্রথম দিকে রোগাক্রান্ত গাছের কান্ড ও ডাল বাদামী রঙ ধারণ করে, ধীরে ধীরে আক্রান্ত ডাল ও কান্ডে লম্বালম্বি ফাটল দেখা দেয়, ফাটল থেকে আঠা বের হতে থাকে, শেষে কাণ্ড বা ডালের সম্পূর্ণ বাকল রিং আকারে নষ্ট হয়ে গাছ মারা যায়। ক্যাংকার রোগ সাধারণতঃ ফল, পাতা, ডগায় এবং শিকড়েও দেখা যায়। এর আক্রমণে প্রথমে হলুদ রঙের পানি ভেজা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাগ দেখা যায়, পরে দাগগুলো বড় হয়ে ফুলে উঠে ও বাদামী রঙের খসখসে ফুসকুড়ির মত দেখায়; আক্রমণ বেশি হলে পাতা হলুদ হয়ে ঝরে পড়ে; ঘন ঘন বৃষ্টি হলে এ রোগ বেশী হতে দেখা যায়। অতিরিক্ত বাতাসজনিত কারণে ও লিফ মাইনার পোকার আক্রমণে গাছের ডাল ও পাতায় যে ক্ষতের সৃষ্টি হয় তার ভিতর দিয়ে এ পোকার জীবাণু সহজেই প্রবেশ করে আক্রমণ করতে পারে। মাল্টা গাছে আগামরা রোগ প্রায়ই দেখা যায়, এটি একটি মারাত্মক রোগ, মাটিতে রস কম ও গাছের খাদ্যঘাটতি থাকলে এ রোগ হতে পারে; এ রোগে গাছের পাতা ঝরে যায় ও আগা থেকে ডালপালা শুকিয়ে নীচের দিকে আসতে থাকে এবং আস্তে আস্তে পুরো গাছটিই মরে যায়।

রোগ থেকে রক্ষা পেতে বা রোগ দমন করতে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে:

- সময়মত এবং সঠিক পরিমাণে সার ও পানি দিয়ে গাছকে সবল ও সতেজ রাখতে হবে; আক্রান্ত ডালপালা ও মরা পাতা নিয়মিত সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে, রোগাক্রান্ত গাছ তুলে পুড়িয়ে ফেলতে হবে; গাছের গোড়ায় যাতে পানি জমে না থাকে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে এবং পানি সরানোর সুব্যবস্থা করতে হবে; বাগান সবসময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।
- আক্রান্ত স্থান ধারালো ছুরি দ্বারা চেঁচে বর্দোপেষ্ট এর প্রলেপ দিতে হবে; ৭০ গ্রাম তুঁতে ও ১৪০ গ্রাম চুন আলাদা পাত্রে গুলিয়ে ১ লিটার পানিতে মিশিয়ে বর্দোপেষ্ট তৈরি করতে হবে; বর্দোপেষ্ট এর পরিবর্তে আলকাতরার প্রলেপও ব্যবহার করা যায়।
- বৃষ্টির মৌসুম শুরুর পূর্বেই ক্যাংকার আক্রান্ত ডাল পালা কেটে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- রোগের জীবাণুবাহক পোকা দমনের জন্য মে থেকে আগষ্ট পর্যন্ত প্রতি মাসে একবার সুমিথিয়ন ৫০ ইসি প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন আদিজোড় যেমনঃ রংপুর লাইম, রাফ লেমন, ক্লিওপেট্রা ম্যান্ডারিন, কাঁটা জামির ইত্যাদি ব্যবহার করতে হবে।
- প্রতি বছর দু'একবার গাছে কপার অক্সিক্লোরাইড জাতীয় ছত্রাকনাশক (কুপ্রাভিট ৫০ ডব্লিউপি) প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে স্প্রে করে দিলে গাছ আগামরা রোগ হতে রক্ষা পাবে।

ফল সংগ্রহ

আশ্বিন মাসের শেষ সপ্তাহ হতে কার্তিক মাসের মাঝামাঝি সময়ে বারি মাল্টা-১ এর ফল সংগ্রহ করতে হয়। ফল পরিপক্ক হলে হাত দ্বারা অথবা হারভেস্টার দ্বারা গাছ হতে ফল সংগ্রহ করা হয়। খেয়াল রাখতে হবে যাতে ফল সংগ্রহের সময় মাটিতে না পড়ে। ৬-৭ বছরের প্রতিটি গাছে গড়ে ২০০-৩০০ টি ফল ধরে। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে গাছ প্রতি ৫০০-৬০০টি পর্যন্ত ফল পাওয়া সম্ভব।

এই প্রযুক্তি ব্যবহারে খরচ ও লাভের পরিমাণ

পাহাড়ি এলাকায় বারি মাল্টা-১ চাষ করলে অধিক ফলন পাওয়া যায়। বারি মাল্টা-১ চাষে খরচ হয় হেক্টরপ্রতি ৩,৫৭,৮২৩ টাকা। হেক্টরপ্রতি উৎপাদিত ফসলের দাম ৭,৪৬,৩০০ টাকা। প্রতি হেক্টরে লাভ ৩,৮৮,৪৭৭ টাকা। লাভ খরচের অনুপাত ২.০৮।

প্রধান গবেষক: ড. জুলফিকার আলী ফিরোজ, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, এইচটিএআরএস, রামগড়, খাগড়াছড়ি, ই-মেইল: zalifiroz63@gmail.com, মোবাইল: ০১৭২৬-১৫৬৫৭৪

১.১৮ পাহাড়ি এলাকায় গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষের আধুনিক কলাকৌশল

পাহাড়ে চাষ করা গ্রীষ্মকালীন টমেটো

টমেটো এটি অত্যন্ত পুষ্টিকর ও সুস্বাদু সবজি। টমেটো কাঁচা, পাকা এবং রান্না করে খাওয়া হয়। প্রতি মৌসুমে বিপুল পরিমাণ টমেটো সস, কেচাপ, চাটনি, জুস এবং সালাদ ইত্যাদি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। সালাদ হিসেবেই অধিকাংশ টমেটো খাওয়া হয়। টমেটোর পুষ্টির পাশাপাশি ভেষজ মূল্যও আছে। এর শাঁস ও জুস হজমে সহায়তা করে ও ক্ষুধা বাড়ায়। অতীতে বাংলাদেশে টমেটো কেবল শীতকালেই পাওয়া যেত, কিন্তু সম্প্রতি বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট নতুন টমেটোর জাত উদ্ভাবন করেছে যা গ্রীষ্মকালেও অবাদ করা যায় ও ভালো ফলন পাওয়া যায়। গ্রীষ্মকালীন টমেটোর আবাদ করে সহজে সারা বছর টমেটো পাওয়া যেতে পারে। পাহাড়ি এলাকায় গ্রীষ্মকালীন টমেটো আবাদের প্রচলন করা এবং উন্নত জাত ও চাষের কৌশল স্থানীয় কৃষকদের অবহিত করার লক্ষ্যে কেজিএফ এর অর্থায়নে পার্বত্য জেলায় বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) কর্তৃক গবেষণা কার্মকাণ্ড পরিচালিত হয়।

উদ্ভাবিত/নির্বাচিত প্রযুক্তির বর্ণনা

মাটি ও জলবায়ু

টমেটো চাষে বেড তৈরি ও চারা রোপণ

টমেটো এদেশে শীতকালীন ফসল। রাতের তাপমাত্রা ২৩ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড এর উপরে থাকলে সাধারণত টমেটো ফল ধরে না। রাতের তাপমাত্রা ২৩ ডিগ্রি সে. এর নিচে থাকলে তা গাছে ফুল ও ফল ধারণের জন্য বেশি উপযোগী। গড় তাপমাত্রা ২০-২৫ ডিগ্রি সে. টমেটোর ভাল ফলনের জন্য সবচেয়ে উপযোগী। বাংলাদেশে গ্রীষ্মকালে (জ্যৈষ্ঠ্য-আশ্বিন) রাতের তাপমাত্রা সর্বত্রই এর বেশি থাকে বিধায় শীতকালীন টমেটোর কোন জাতে ফল ধরে না, কিন্তু বারি কর্তৃক নতুন উদ্ভাবিত গ্রীষ্মকালীন জাতগুলিতে রাতের তাপমাত্রায় ২৩ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এর উপরে হলেও ফল ধরে। আলো-বাতাসযুক্ত উর্বর দোঁআশ মাটি টমেটো চাষের

জন্য সবচেয়ে ভাল। তবে উপযুক্ত পরিচর্যায় বেলে দোঁআশ থেকে এটেল দোঁআশ সব মাটিতেই টমেটো ভাল জন্মে। এ্যাসিড মাটি হলে জমিতে চুন দেয়া উচিত।

গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষের কৌশল

বীজতলায় চারা তৈরি: টমেটো চাষ আরম্ভের আগে ভাল জাতের (বারি হাইব্রিড টমেটো-৪) ও মানের বীজ সংগ্রহ করতে হবে। সবল চারা উৎপাদনের জন্য প্রথমে ৫০ গ্রাম সুস্থ বীজ ঘন করে ৩ মি. লম্বা ও ১মি. চওড়া বীজতলায় জ্যৈষ্ঠ্য-ভাদ্র মাসে বীজ বুনতে হবে। এক হেক্টর জমিতে টমেটো চাষের জন্য প্রথমে এমন ৪টি বীজতলা তৈরি করতে হবে। বীজ গজানোর ৮-১০ দিন পর চারা দ্বিতীয় বীজতলায় ৪৪ সেমি দূরত্বে রোপা করতে হবে।

গ্রীষ্মকালে টমেটো চাষের জন্য বেডে স্বচ্ছ পলিথিন দিয়ে তৈরি ছাউনি

এক হেক্টর জমিতে টমেটো চাষের জন্য এরূপ ২২ টি বীজতলার প্রয়োজন হয়। বীজতলায় ৪০-৬০ মেস (প্রতি ইঞ্চিতে ৪০-৬০ টি ছিদ্র যুক্ত) নাইলন নেট দিয়ে ঢেকে চারা তৈরি করলে চারা অবস্থায় সাদা মাছি পোকার দ্বারা পাতা কোঁকড়ানো ভাইরাস রোগ ছড়ানোর হাত থেকে নিস্তার পাওয়া যায়। চারার বয়স ২৫-৩০ দিন অথবা ৪-৬ পাতা বিশিষ্ট হলে জমিতে রোপণ করার উপযুক্ত হয়।

জমি তৈরি: টমেটোর ভাল ফলনের জন্য জমি ৪-৫ বার চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুর ঝুরে করে নিতে হবে। বেডের আকার ২০-৩০ সেমি. উঁচু এবং ২৩০ সেমি. চওড়া করতে হবে। সেচ ও পানি সরানোর জন্য বেডের চার পাশে ৭৫ সেমি. চওড়া ড্রেন বা নালা তৈরি করতে হবে।

চারা রোপণ ছাউনি দেয়া: বেডে উপর ২০-২৫ দিন বয়সের চারা দুই সারি করে রোপন করতে হয়। সারি থেকে সারির দূরত্ব ৬০ সেমি. এবং প্রতি সারিতে চারা থেকে চারার দূরত্ব ৪০ সেমি. হবে। চারা তোলার আগে বীজতলার মাটি ভাল করে ভিজিয়ে নিতে হয় যাতে চারার শিকড় ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। প্রতি শতক জমিতে মোট ১৮০ টি চারা রোপণ করা যায়। এ হিসাবে মোট চারার সংখ্যা হয় ২০০/শতক বা ৪৫০০/বিঘা বা প্রায় ৩৪০০০/হে.।

গ্রীষ্মকালে টমেটো উৎপাদনের জন্য বেডে স্বচ্ছ পলিথিন দিয়ে ছাউনি দিতে হয়। মাঝে ৩০ সেমি. নালাসহ ২.৩ মিটার চওড়া দুটি বেড-এ লম্বালম্বিভাবে ১টি করে ছাউনির ব্যবস্থা করতে হবে। ছাউনির উচ্চতা হবে দু' পাশে ১৩৫ সেমি. ও মাঝখানে ১৮০ সেমি.। দু'টি ছাউনির মাঝে অন্তত ৭৫ সেমি. নালা রাখতে হবে যাতে ছাউনি থেকে পড়া বৃষ্টির পানি নিস্কাশনসহ বিভিন্ন পরিচর্যা করতে সুবিধা হয়। পলিথিন ছাউনি লম্বায় জমির আকার-আকৃতির উপর নির্ভর করে কমবেশি হতে পারে কিন্তু চওড়া ২.৩ মিটার হওয়া বাঞ্ছণীয়।

সার ব্যবস্থাপনা: প্রতি হেক্টর জমিতে পঁচা গোবর ১০ টন, ইউরিয়া ৫৫০ কেজি, টিএসপি ৪৫০ কেজি, এমওপি ২৫০ কেজি, জিপসাম ১২০ কেজি এবং সোডিয়াম মলিবডেট ৫৫০ গ্রাম প্রয়োগ করতে হবে। সারের প্রকার ও মাত্রা জমির উর্বরতার উপর ভিত্তি করে ভিন্নতর হতে পারে। অর্ধেক গোবর সার ও অর্ধেক টিএসপি এবং সমস্ত জিপসাম, বোরন ও সোডিয়াম মলিবিডেনাম জমি তৈরির সময় দিতে হয়। অবশিষ্ট গোবর, টিএসপি চারা লাগানোর ৭ দিন পূর্বে গর্তে

টমেটো গাছের জন্য ঠেকনা ও পানি সরানোর নালা

প্রয়োগ করতে হয়। উপরি প্রয়োগের জন্য ইউরিয়া এবং এমপি সার সমান ৩ কিস্তিতে যথাক্রমে ২১, ৩৫ ও ৫০ দিন পর গাছের গোড়ার ১০-১৫ সেমি. দূর দিয়ে মাটির সঙ্গে ভালো করে মিশিয়ে দিতে হবে। প্রতি শতক জমিতে তৈরি টানেলে গোবর ৫০ কেজি টিএসপি ১.৫ কেজি, এমওপি ১.২ কেজি, ইউরিয়া ২.৫ কেজি (সারের মাত্রা জমির উর্বরতার উপর নির্ভর করে কমবেশি হতে পারে) মাটির ১৫-২০ সেমি গভীরে কম্পোস্ট বা ভালভাবে পচা গোবর প্রয়োগ করতে হয়, এতে গাছ ভালভাবে খাবার নিতে পারে এবং মাটির গুণাগুণ উন্নত হয়। এছাড়া সব টিএস পি ও অর্ধেক এমপি সার শেষ চাষের সময় মাটিতে সমভাবে ছিটিয়ে দিতে হয়। ইউরিয়া সার তিন ভাগে ভাগ করে চারা মাটিতে লেগে যাওয়ার পর ১৫-২০ দিন অন্তর অন্তর প্রয়োগ করতে হয়।

সেচ ও পানি নিষ্কাশন: চারা রোপণের ৩-৪ দিন পর পর্যন্ত হালকা সেচ ও পরবর্তীতে প্রতি কিস্তি সার দেয়ার পর জমিতে সেচ দিতে হয়। গ্রীষ্ম মৌসুমে টমেটো চাষের জন্য ঘন ঘন সেচের প্রয়োজন হয়। বর্ষা মৌসুমে তেমন একটা সেচের প্রয়োজন হয় না। টমেটো গাছ গোড়ায় পানি জমে থাকা সহ্য করতে পারে না। সেচ অথবা বৃষ্টির অতিরিক্ত পানি দ্রুত সরানোর জন্য নালা পরিমিত চওড়া (৩০-৪০ সেমি) এবং এক দিকে সমান ঢালু হওয়া বাঞ্ছণীয়।

আগাছা দমন, মালচিং ও ঠেকনা: টমেটোর জমি প্রয়োজনীয় নিড়ানি দিয়ে আগাছামুক্ত রাখতে হবে। প্রতিটি সেচের পরে মাটির উপরিভাগের চটা ভেঙ্গে দিতে হবে যাতে মাটিতে পর্যাপ্ত বাতাস চলাচল করতে পারে। ১ম ফুলের গোছার ঠিক নিচের কুশিটি ছাড়া নিচের সব পার্শ্ব কুশি ছাঁটাই করতে হবে। গাছে বাঁশের খুঁটি দিয়ে ঠেকনা দিতে হবে।

ফল সংগ্রহ: ফলের নিচে ফুল ঝরে যাওয়ার পর যে দাগ থাকে ঐ স্থান থেকে লালচে ভাব শুরু হলেই বাজারে বিক্রির জন্য ফল তুলতে হবে। এতে ফল অনেকদিন পর্যন্ত ভালো রাখা যায়।

এই প্রযুক্তি ব্যবহারে খরচ ও লাভের পরিমাণ

পাহাড়ি এলাকায় গ্রীষ্মকালীন টমেটোর চাষ করলে অধিক ফলন পাওয়া যায় এবং এর ফলে পাহাড়ী চাষীগণ আর্থিকভাবে লাভবান তে পারেন। বারি গ্রীষ্মকালীন টমেটোর চাষে খরচ হয় হেক্টরপ্রতি প্রায় ১৫,২০,৬০০ টাকা আর উৎপাদিত ফসলের দাম প্রায় ৩২,২১,৫০০ টাকা। প্রতি হেক্টরে লাভ প্রায় ১৭,০০,৯০০ টাকা। লাভ খরচের অনুপাত ২.১১।

প্রধান গবেষক: ড. মোঃ আমিন, সাবেক মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, আরএআরএস, হাটহাজারী, বারি, চট্টগ্রাম।

১.১৯ পাহাড়ি এলাকায় শিম চাষ

শিম ফসল

পার্বত্য অঞ্চলে শিম এবং এর বীজ উভয়ই জনপ্রিয় শীতকালীন সবজি। শিম একটি উচ্চ আশঁযুক্ত, ভিটামিন এবং খনিজ সমৃদ্ধ খাবার যা মানুষের জন্য খুবই উপকারী। এছাড়া শিম গাছ বাতাস থেকে নাইট্রোজেন সংগ্রহ মাটিতে যুক্ত করতে পারে যা মাটির উর্বরতা বাড়ায়, শিম তুলে সেই গাছ মাটিতে মিশিয়ে দিলে পরের ফসল চাষে জমিতে নাইট্রোজেন সার যেমন ইউরিয়া কম দিতে হয়। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) কর্তৃক উদ্ভাবিত উন্নত শিমের জাত বারি শিম-৬ সবজি হিসেবে বাণিজ্যিকভাবে ও বসতবাড়িতে চাষাবাদ হচ্ছে। জাতটি বাংলাদেশের সকল এলাকায় চাষাবাদ উপযোগী। শিম শীতকালীন সবজি হলেও বর্তমানে গ্রীষ্মকালেও এর চাষ হচ্ছে। কেজিএফ-এর অর্থায়নে পাহাড়ী এলাকায় বারি শিম-৬ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কেজিএফ এর অর্থায়নে পার্বত্য চট্টগ্রামে এই শিম জাতের সম্প্রসারণ কার্মকান্ড পরিচালিত হয়।

উদ্ভাবিত/নির্বাচিত প্রযুক্তির বর্ণনা

মাটি ও জলবায়ু

সব ধরনের মাটিতেই শিম জন্মে। তবে পানি জমে থাকে না এমন দোআঁশ ও বেলে দোআঁশ মাটি ভাল ফলনের জন্য উপযুক্ত। শিম গাছের বৃদ্ধির জন্য উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়া এবং লম্বা দিন, আবার ফুল আসার জন্য কম তাপমাত্রা ও ছোট দিন দরকার হয়। শিম যখনই বোনা হোক না কেন শীতের প্রভাব না পড়লে ফুল আসে না। তবে গ্রীষ্মকালীন জাতগুলোর জন্য তাপমাত্রা ও দিন বড় বা ছোট কোন সমস্যা না হওয়ায় বছরের যে কোন সময় বপন/রোপণ করলে ফুল আসে।

জমি তৈরি ও বীজ বোনা

জমি ৪-৫টি চাষ দিয়ে ঢেলা ভেঙ্গে খুব পরিপাটি করে তৈরি করতে হয়। সমতল জমিতে সঠিক দূরত্বে উঁচু মাদা তৈরি করে বীজ বোনা ও চারা রোপা করা যায়, তবে সেচ ও পানি বের হওয়ার এবং পরবর্তী পরিচর্যার সুবিধার জন্য মিড়ি তৈরি করে মিড়িতে বীজ বোনা সবচেয়ে ভাল। মিড়ি ১৫ থেকে ২৫ সেমি উঁচু এবং ২.৫ মিটার চওড়া হবে। জমির প্রকৃতি এবং কাজের সুবিধা বিবেচনা করে মিড়ির দৈর্ঘ্য ঠিক করতে হয়। সেচ ও পানি সরানোর সুবিধার জন্য পাশাপাশি দুটি মিড়ির মাঝখানে ৫০ সেমি চওড়া ১৫ থেকে ২৫ সেমি গভীর নালা রাখতে হয়; ২.৫ মিটার চওড়া মিড়ির উভয় পাশে ৫০ সেমি করে বাদ দিয়ে ১.৫ মিটার দূরত্বে মিড়ির লম্বালম্বি দু'টি লাইন টেনে নিতে হবে। মিড়ির ২ লাইন বা সারিতে ১.৫ মিটার দূরে দূরে ৩০×৩০×৩০ সেমি সাইজের মাদা প্রয়োজনীয় সার দিয়ে তৈরি করে ফেলতে হবে।

আষাঢ় মাসের মাঝামাঝি থেকে বীজ বপন করা যেতে পারে, তবে আগাম ফসলের জন্য জৈষ্ঠ্যের মাঝামাঝি থেকে আষাঢ়ের মাঝামাঝি (জুন মাস) সময়ে বীজ বোনা উত্তম । বীজের হার প্রতি হেক্টরে ৭.৫ কেজি বা একরে ৩.০ কেজি বা শতকে ৩০ গ্রাম। বোনার সময় সারি থেকে সারির দূরত্ব ১.৫ মিটার এবং সারিতে গাছ থেকে গাছের দূরত্ব হতে হবে ১.৫ মিটার। তাছাড়া, ২টি মিড়ির মধ্যে ৫০ সেমি চওড়া নালা থাকায় পাশাপাশি দু'টি মিড়ির নিকটতম সারি দু'টির দূরত্ব হল ১.৫ মিটার। আজকাল অবশ্য ১ মিটার চওড়া মিড়ির উপর একক সারি পদ্ধতিতেও ১.০-১.৫ মিটার দূরত্বে বীজ বপন/চারা রোপণ করা হয়। উভয় পদ্ধতিতে একই সাইজের জমিতে গাছের সংখ্যা সমান হয়, তবে দ্বিতীয় পদ্ধতিতে গাছের পরিচর্যা ও ফসল তোলার কাজ করা সুবিধাজনক।

সার ব্যবস্থাপনা

শিম ডাল জাতীয় ফসল, এতে সারের পরিমাণ বিশেষ করে নাইট্রোজেন সারের পরিমাণ কম লাগে। নিচের সারণীতে সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি উল্লেখ করা হলো:

শিম চাষে হেক্টরপ্রতি সার প্রয়োগের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি

গার	মোট পরিমাণ	শেষ চাষের সময় প্রয়োগ	বপন/চারা রোপণের সময় গর্তে প্রয়োগ	গর্তে উপরি প্রয়োগ (বপনের/রোপণের ৩০ দিন পর)
গোবর	১০ টন	সব	-	-
ইউরিয়া	২৫ কেজি	-	অর্ধেক	অর্ধেক
টিএসপি	৯০ কেজি	-	গব	-
এমপি	৬০ কেজি	-	অর্ধেক	অর্ধেক
জিপসাম	৬০ কেজি	সব	-	-
বরিক এসিড	৫ কেজি	সব	-	-

সার ছিটিয়ে দিয়ে মাদার মাটির ১০ সেমি গভীর পর্যন্ত কোদাল দিয়ে হালকা কুপিয়ে ভালভাবে মাটিতে মিশিয়ে দিতে হবে।

ফসলের পরিচর্যা

- বপনকৃত বীজ থেকে চারা বের হওয়ার পর ৮-১০ দিনের মধ্যেই প্রতিটি মাদায় একটি সুস্থ সবল চারা রেখে বাকিগুলি উঠিয়ে ফেলতে হবে।
- শিমের ক্ষেত সর্বদা আগাছামুক্ত রাখতে হবে।
- গাছ ২৫-৩০ সেমি উঁচু হলেই বাউনী দিতে হবে এবং মাচা তৈরি করে শিম গাছ তার উপর তুলে দিতে হবে। চারা গাছ মাচায় উঠা পর্যন্ত গোড়ার দিকে যেন না পেচাতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। গোড়া পেচাতে না দিলে গাছের বৃদ্ধি ও ফলন প্রায় ১০-১৫% বেশি হয়।
- মাটির রস যাচাই করে ১০-১৫ দিন পর পর সেচ দিতে হবে।
- পুরাতন পাতা ও ফুলবিহীন ডগা/শাখা কেটে ফেলতে হবে।

পোকামাকড় ও রোগবালাই দমন

শিমের প্রধান ক্ষতিকারক পোকা হলো জাব পোকা, ফল ছিদ্রকারী পোকা ও থ্রিপস। জাব পোকা গাছের কচি ডগা, পাতা, ফুল ও ফল ইত্যাদির রস চুষে খায়। ফলে ফলনের মারাত্মক ক্ষতি হয়। সরাসরি ক্ষতি ছাড়াও এ সব পোকা মোজাইক ভাইরাস রোগ ছড়ায়। ফল ছিদ্রকারী পোকার ডিম থেকে বের হয়ে আসা কীড়া ফুল, ফুলের কুঁড়ি, কচি ফল ছিদ্র করে ভিতরে ঢুকে পড়ে। থ্রিপস পাতা থেকে রস চুষে খায়, এই পোকার আক্রমণে শিমের উৎপাদন ব্যাপক হ্রাস পায়। উল্লেখিত পোকা ৩টির প্রতিকারের জন্য নিম্নের বিষয়গুলো অনুসরণ করতে হবে:

শিম ফসল সংগ্রহ

- আক্রান্ত অংশ তুলে ফেলে দিতে হবে।
- গুঁড়া সাবান পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। আঁঠাফাঁদ পেতে অর্থাৎ জমিতে ৩ মিটার দূরে দূরে ৩০ সেমি. বাই ৩০ সেমি. আকারের বোর্ডে গ্রিজ/আঁঠা লাগিয়ে ফাঁদ পেতে থ্রিপস পোকাকে আকৃষ্ট করে মারা যায়। গাছগুলো আক্রান্ত বেশি হলে মেলাথিয়ন ৫৭ ইসি জাতীয় কীটনাশক ২ মিলি/লিটার পানি হারে মিশিয়ে স্প্রে করা যেতে পারে।
- নিমের বীজের শাঁস পিষে পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করেও এ পোকা দমন করা যায়।
- ভাইরাস আক্রান্ত গাছগুলো মাটিসহ উঠিয়ে গভীর গর্তে পুঁতে ফেলতে হবে।

শিম গাছে অ্যানথ্রাকনোজ বা ফল পচা রোগ হয়। এ রোগ দমনে রোগমুক্ত বীজ ব্যবহার করতে হবে। ছত্রাকনাশক যেমন, ব্যাভিস্টিন/নোইন/একোনাজল প্রয়োগ করা যেতে পারে।

ফসল সংগ্রহ ও ফলন

*সোজা*ভেদে বীজ বোনার ৯৫-১৪৫ দিন পর শিমের শুঁটি (পড) গাছ থেকে তুলে বাজারে বিক্রি করা যেতে পারে। ফুল ফোটার ২৫ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে শিম তোলার সবচেয়ে উপযুক্ত সময়; ৫-৭ দিন অন্তর অন্তর গাছ থেকে শিম তুললে মোট ১৩-১৪ বার ভালো মানের শুঁটি (পড) সংগ্রহ করা যায় এবং এতে হেক্টর প্রতি প্রায় ১৫-২০ টন শিম পাওয়া যায়।

এই প্রযুক্তি ব্যবহারে খরচ ও লাভের পরিমাণ

পাহাড়ী এলাকায় বারি শিম-৬ চাষ করলে অধিক ফলন পাওয়া যায় এবং এর দ্বারা পাহাড়ী চাষীগণ ভালো আয় করতে পারেন। বারি শিম-৬ চাষে খরচ হয় হেক্টর প্রতি ১,৪৫১৪৮ টাকা। হেক্টর প্রতি উৎপাদিত ফসলের দাম ৩,৪২,০৫০ টাকা। প্রতি হেক্টরে লাভ ১,৯৬,৯০২ টাকা। লাভ খরচের অনুপাত ২.৩৫।

প্রধান গবেষক: ড. মোঃ আমিন, সাবেক মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, আরএআরএস, হাটহাজারী, বারি, চট্টগ্রাম।

১.২০ পাহাড়ি অ্যাসিড মাটিতে চুন প্রয়োগের মাধ্যমে সবজি চাষ

পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি অঞ্চলের মাটি সাধারণত এসিড (অম্লীয়) মাটি। অম্লীয় মাটিতে সবজি চাষ করা হলে আশানুযায়ী ফলন পাওয়া যায় না। কারণ, মাটি অম্লীয় হলে মাটিতে ফসফরাস ও আরো কিছু পুষ্টি উপাদান যথেষ্ট পরমিাণে গাছের জন্য পাওয়া যায় না। তাছাড়া অম্লীয় মাটিতে সবজি ফসলের গুণগত মানও ভাল হয় না। মাটিতে চুন প্রয়োগ করে এ অবস্থার উন্নতি ঘটানো যায়। কেজিএফ প্রকল্পে পাহাড়ি অঞ্চলের অম্লীয় মাটিতে চুন প্রযোগ করে সবজি চাষ বিষয়ে কৃষকের মাঠে গবেষণা করা হয়েছে।

পাহাড়ী জমিতে সবজি চাষ

উদ্ভাবিত প্রযুক্তির বর্ণনা

এলাকা: ভরাখালী, বান্দরবান, জিরোমাইল, খাগড়াছড়ি ও রাজস্থলী, রাঙ্গামাটি।

ফসল: শীতকালীন সবজি যথা, মরিচ, ফুলকপি, বাঁধাকপি, টমেটো ও বেগুন।

জলবায়ু ও মাটি: গড় তাপমাত্র (২০-২৫ ডিগ্রি সেঃ) ভাল ফলনের জন্য সবচেয়ে উপযোগী। উচ্চ তাপমাত্র ও বাতাসের আর্দ্রতা গাছের রোগ বিস্তারে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। মাটির অম্লতার মান ৬-৭ হলেই ভাল তবে মাটির অম্লতার মান এর চেয়ে কম হলে চুন প্রয়োগ করা উচিত।

পাহাড়ী ঢালের জমিতে সবজির চারা রোপণ

জাত নির্বাচন: টমেটো- হিরো প্লাস ও সুরক্ষা, ফুলকপি- স্নো বক্স, সিলভার স্টার ও কোয়াইট এক্সেল, বাঁধাকপি- এটলাস ৭২,৭০ ও মিউজিক, মরিচ-এনএস ১৭০১, বেগুন- স্থানীয় জাত।

জমি তৈরি: সবজির ভাল ফলন অনেকাংশেই জমি তৈরির উপর নির্ভর করে। জমি চাষ করার ১০-১৫ দিন আগে জমিতে এগ্রিকালচারাল চুন অথবা ডলোচুন ব্যবহার করা হয়। ৪-৫ বার চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করা হয়।

বীজ বপনের সময়: আশ্বিন ও কার্তিক (মধ্য সেপ্টেম্বর - মধ্য নভেম্বর)।

চারা রোপণ: কার্তিক ও অগ্রহায়ণ (মধ্য অক্টোবর - মধ্য ডিসেম্বর) এর মাঝামাঝি সময়ে চারা রোপণ করা হয়। চারার বয়স ২৫-৩০ দিন অথবা ৪-৫ পাতা বিশিষ্ট হলে মূল জমিতে রোপন করা হয়। পিট বা গর্ত তৈরির ক্ষেত্রে চারার দূরত্ব গড়ে ৫০-৬০ সেমি বজায় রাখতে হয়। বীজতলা থেকে চারা অত্যন্ত যত্ন সহকারে তুলতে হবে যাতে চারার শিকর ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

চুনের পরিমাণ: ৮ কেজি/শতক (হেক্টরপ্রতি ২ টন)

সারের মাত্রা: নিচের ছকে দওয়া হলো।

উসল	সারের মাত্রা (কেজি/হে)					
	ইউরিয়া	টিএসপি	পটাশ	জিপসাম	জিংক সালফেট	বোরিক এসিড
টমেটো	৩০০	২০০	২০০	৮০-১০০	১৬	১০
ফুলকপি	২৫০-৩০০	১৫০-২০০	২০০-২৫০	৮০-১০০	১৬	১০
বাঁধাকপি	৩০০-৩৫০	২০০-২৫০	২৫০-৩০০	৮০-১০০	১৬	১০
মরিচ	২২০	৩৩০	২০০	৮০-১০০	১৬	১০
বেগুন	২৬০-৩০০	২৫০	২০০	৮০-১০০	১৬	১০

সার প্রয়োগ পদ্ধতিঃ প্রথম চাষের আগে সম্পূর্ণ চুন ও শেষ চাষের সময় সম্পূর্ণ গোবর, টিএসপি, জিপসাম, বোরিক এসিড, জিংক সালফেট এবং অর্ধেক ইউরিয়া জমিতে সমানভাবে ছিটিয়ে মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। বাকী ইউরিয়া ও এমওপি তিন কিস্তিতে চারা লাগানোর ১৫ দিন পর, ফুল ও ফল ধরার সময় আগে সমভাবে প্রয়োগ করতে হবে।

অন্তর্বর্তীকালীন পরিচযা: জমিতে প্রয়োজনীয় নিড়ানি দিয়ে আগছামুক্ত রাখতে হবে। প্রতিটি সেচের পর মাটির উপরিভাগের চটা ভেঙ্গে দিতে হবে, যাতে মাটিতে পর্যাপ্ত বাতাস চলাচল করতে পারে। আগাছার প্রকোপ বেশি হলে আগাছানাশক ব্যবহার করা যেতে পারে।

চারা রোপণের ৩-৪ দিন পর্যন্ত হালকা সেচ ও পরবর্তীতে প্রতি কিস্তিতে সার প্রয়োগের পর সেচ দিতে হবে।

পোকামাকড় ও রোগ ব্যবস্থাপনা- চুন প্রয়োগের কারণে পোকামকড় ও রোগ সাধারণত এখন খুবই কম দেখা যায়। পোকামাকড় ও রোগের প্রকোপ হলে তখন প্রয়োজনীয় ফসল অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ফসল সংগ্রহ: শীতকালীন সবগুলো সবজিই মধ্য পৌষ - মধ্য মাঘ (জানুয়ারী - ফেব্রুয়ারী) মাসের মধ্যে সংগ্রহের সময় হয়ে যায়।

- টমেটোর ক্ষেত্রে ফলের নিচের ফুল ঝরে যাওয়ার পর যে দাগ থাকে ঐ স্থান থেকে লালচে ভাব শুরু হলেই ফল সংগ্রহ করা যায়।
- ফুলকপির ফুল আসার ৮০-৯০ দিন পর সংগ্রহের উপযুক্ত হয়।
- বাঁধাকপির ক্ষেত্রে হেড ৬০-৭০ দিনের মধ্যে সংগ্রহ করতে হবে।
- চারা রোপণের ৭০-৭৫ দিন পরই মরিচের ফল সংগ্রহ করতে হবে।

বেগুনের চারা লাগানোর ৫০-৬০ পরই ফসল কাটার সময় হয় তবে ৭-১০ দিন পরপর ধারালো ছুরির সাহায্যে বেগুন সংগ্রহ করতে হয়।

গড় ফলন: টমেটো ৩১-৬২, ফুলকপি ৪০-৮৩, বাঁধাকপি ৬৫-৮৫, মরিচ ৮-১৬ ও বেগুনের ৩৮-৬৬ টন/হে।

এই প্রযুক্তি ব্যবহারে খরচ ও লাভের পরিমাণ

পাহাড়ি অম্লীয় মাটিতে চুন ও সুষম সার ব্যবহার করে কৃষকগণ সবজি চাষ করে ভাল ফলন পেতে পারেন এবং সবজির গুনগত মানও উন্নত হতে পারে যার ফলে কৃষক বাজারে ভাল দামও পান। পরিণামে কৃষকগণ অর্থনৈতিকভাবে আগের তুলনায় অনেক বেশি স্বাবলম্বী হতে পারবনে।

প্রধান গবেষক: প্রফেসর ড. আলোক কুমার পল, মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ, শেরে-ই-বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, মোবাইল: ০১৭১৫২১৩০৮৩, ই-মেইল:

১.২১ পাহাড়ি এলাকায় বারি কলা-৩ চাষের আধুনিক কলাকৌশল

পাহাড়ি ভূমিতে কলার চাষ

কলা বাংলাদেশের সর্বপ্রধান ফল যা সারা বছর প্রায় একই হারে বাজারে পাওয়া যায়। বাংলাদেশে উৎপাদিত বিভিন্ন ফলের মধ্যে কলা উৎপাদনই সবচেয়ে বেশি। ইহা সুস্বাদু, সহজলভ্য ও পুষ্টিকর এবং ফলন অন্যান্য ফল ও ফসল অপেক্ষা অনেক বেশি। কলাতে অনেক পুষ্টি উপাদান আছে যা মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। পাকা কলা ফল হিসাবে সবার পছন্দ আবার কাঁচা কলা ভর্তা, ভাজি, তরকারী ও চপ হিসাবেও সুস্বাদু। পাহাড়ি এলাকা ও এর আবহাওয়া কলা চাষের জন্য উপযোগী। অন্যান্য ফসলের তুলনায় কলা গাছ থেকে সারা বছরের ফলের যোগান পর্যায়ক্রমে আসে। পাহাড়ের জমিতে বাণিজ্যিকভাবে কলা চাষ হচ্ছে। পাহাড়ী এলাকায় অধিকাংশই টিলার উপরে বা স্বল্প ঢালবিশিষ্ট জমিতে কোথাও বা সমতল ভূমিতে চাষ করা হয়। কলার উপযুক্ত জাত নির্বাচন করে পাহাড়ের ঢালেও গর্ত করে কলাগাছ লাগানো যায়। পাহাড়ি এলাকায় কলার উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কেজিএফ এর অর্থায়নে পার্বত্য জেলায় বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক গবেষণা কার্যক্রম আরম্ভ করা হয় এবং নির্বাচিত কলার জাতের সম্প্রসারণ কার্মকান্ড পরিচালিত হয়।

উদ্ভাবিত/নির্বাচিত প্রযুক্তির বর্ণনা

কলার জাত

বাংলাদেশে অনেক জাতের কলা আছে তার মধ্যে বারি কলা-৩ (বাংলা কলা) পার্বত্য অঞ্চলের জন্য সবচেয়ে বেশি উপযোগী।

বংশ বিস্তার

কলা গাছের রাইজম বা গোড়া থেকে অঙ্গজভাবে উৎপন্ন সাকার ও তেউড়ের সাহায্যে কলার বংশ বিস্তার হয়ে থাকে। গাছের গোড়া থেকে দু'ধরনের তেউড় বা চারা বের হয়, যথা- অসি তেউড় ও পানি তেউড়। অসি তেউড় বের হয় মূল কন্দ থেকে। অসি তেউড়ের পাতা সরু, গুড়ি বড় এবং চারা শক্তিশালী। ভুয়া কাণ্ড ক্রমশ গোড়া থেকে উপরের দিকে সরু, দেখতে অনেকটা তলোয়ারের মত। অপরদিকে, পানি তেউড় বের হয় গাছ রোগাক্রান্ত বা আঘাতপ্রাপ্ত হলে অথবা ফল আহরণের পর। পানি তেউড়ের পাতা চওড়া, গুড়ি দুর্বল ও ছোট।

মাটি ও জলবায়ু

পর্যাপ্ত রোদযুক্ত ও পানি নিকাশের সুব্যবস্থাসম্পন্ন উর্বর দো-আঁশ ও বেলে দো-আঁশ মাটি কলা চাষের জন্য উত্তম। গাছের বৃদ্ধি এবং উৎপাদনের জন্য সবচেয়ে উপযোগী তাপমাত্রা ১৫-৩৫° সে.। তাপমাত্রা ১৩°সে. এর নিচে কলা গাছ ঠান্ডায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রতি মাসে গড়ে ১২০ সেমি বৃষ্টিপাত কলা চাষের জন্য অনুকুল। শুষ্ক আবহাওয়া বা দীর্ঘকালীন খরা, শিলাবৃষ্টি, ঝড় সাইক্লোন ও বন্যা কলা চাষের অন্তরায়।

চারা নির্বাচন

বাণিজ্যিকভাবে চাষাবাদের জন্য অসি তেউড় লাগাতে হবে। তিন-চার মাস বয়স্ক সুস্থ সবল অসি তেউড় রোগমুক্ত বাগান থেকে সংগ্রহ করা উচিৎ। সাধারণত বেঁটে জাতের গাছের ক্ষেত্রে ১ হাতের একটু কম এবং লম্বা জাতের ক্ষেত্রে ১ হাত (৫০ সেমি) বা ১ হাতের একটু বেশি দৈর্ঘ্যের ১.৫-২.০ কেজি ওজনের চারা লাগানো হয়।

জমি তৈরি, গর্ত খনন ও চারা রোপণ

জমি ভালভাবে চাষ করে ২-২.৫ মিটার বা ৪-৫ হাত দূরে দূরে ১X১X১ হাত আকারের গর্ত খনন করতে হয়। এই দূরত্ব অনুসরণ করলে প্রতি হেক্টর জমিতে প্রায় ২৫০০ টি গাছ বা প্রতি একর জমিতে প্রায় ১০০০ টি গাছ বা প্রতি কানি জমিতে প্রায় ৪০০ টি গাছ রোপণ করা সম্ভব। চারা রোপনের ১৫-২০ দিন আগেই গর্তে গোবর সার ও টিএসপি মাটির সাথে মিশিয়ে গর্ত বন্ধ করে রাখতে হবে। চারা রোপণের পর পানি দিয়ে জমি ভালভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে।

রোপণের সময়

বছরের যে কোন সময়েই কলার চারা রোপণ করা যায়। তবে অতিরিক্ত বর্ষা ও অতিরিক্ত শীতের সময় চারা রোপণ না করাই উত্তম। বর্ষার শেষে আশ্বিন-কার্তিক মাস চারা রোপণের সর্বোত্তম সময়। এ সময় মাটিতে যথেষ্ট রস থাকে, ফলে সেচের প্রয়োজন হয় না। এ সময়ে রোপিত চারার ফলন সবচেয়ে বেশি হয়। কলার চারা রোপণের দ্বিতীয় সর্বোত্তম সময় হল মাঘ মাস। এ সময় চারা রোপণের জন্য পানি সেচ অত্যাবশ্যক।

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ

কলার সাথে আন্তঃফসল

মধ্যম উর্বর জমির জন্য গাছ প্রতি গোবর/আর্বজনা পচা সার ১০ কেজি, ইউরিয়া ৮৭৫ গ্রাম, টিএসপি ৭০০ গ্রাম, এমওপি ১০৫০ গ্রাম, জিপসাম ৩৫০ গ্রাম, জিঙ্ক অক্সাইড ২.৫ গ্রাম ও বরিক এসিড ৩.৫ গ্রাম প্রয়োগ করতে হবে। উল্লিখিত পরিমাণের সম্পূর্ণ গোবর, টিএসপি, জিপসাম, জিঙ্ক অক্সাইড ও বরিক এসিড এবং অর্ধেক এমওপি সার গর্ত তৈরির সময় গর্তে দিতে হয়। ইউরিয়া ও বাকী অর্ধেক এমওপি চারা রোপণের ২ মাস পর থেকে ২ মাস পর পর ৩ বারে এবং ফুল আসার পর আরও একবার গাছের চর্তুদিকে ছিটিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হয়। সার দেয়ার সময় জমি হালকাভাবে কোপাতে হবে যাতে শিকড় কেটে না যায়। জমির আর্দ্রতা কম থাকলে সার দেয়ার পর পানি সেচ দেয়া একান্ত প্রয়োজন। তবে পাহাড়ের ঢালে মাটি না কুপিয়ে চোকা মাথা খুঁটির সাহায্যে ১০-২০টি গর্ত করে সার প্রয়োগ করে গর্তের মুখ বন্ধ করে দেয়া হয়।

পানি সেচ ও নিকাশ

শুষ্ক মৌসুমে ১০-১৫ দিন পর পর জমিতে সেচ দেয়া দরকার। আবার বর্ষার সময় বাগানে যাতে পানি জমতে না পারে, তার জন্য নালা করে অতিরিক্ত পানি নিকাশের ব্যবস্থা করতে হয়।

সাকার বা চারা ছাঁটাই

কলার কাঁদি বের হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত গাছের গোড়ায় কোন চারা রাখা উচিত নয়। কাঁদি সম্পূর্ণ বের হওয়ার পর মুড়ি ফসলের জন্য গাছপ্রতি মাত্র একটি চারা রেখে বাকি চারাগুলো মাটির সমতলে কেটে ফেলতে হবে।

অন্যান্য পরিচর্যা

সময়মত বেড়া নির্মাণ, আগাছা দমন, ঠেস দেয়া, অপ্রয়োজনীয় পাতা পরিষ্কার, গোড়ায় মাটি দেয়া, অপসারণ, কাঁদি ঢেকে দেয়া ইত্যাদি কাজ করা দরকার।

আন্তঃ ফসলের চাষ

আশ্বিন-কার্তিক মাসে রোপিত চারার ৩-৪ মাস তেমন বৃদ্ধি না হওয়ায় দুই-তৃতীয়াংশ জায়গা পতিত থাকে। তখন কলা বাগানে কলার ক্ষতি না করে আন্তঃফসল হিসাবে শীতকালীন শাক-সবজি, পেঁয়াজ, আলু, মুলা, গাজর, ধনিয়া, মসুর, সরিষা ইত্যাদি চাষ করে বাড়তি কিছু আয় করা যায়। আন্তঃফসলের চাষ করতে হলে অতিরিক্ত কিছু সারও প্রয়োগ করতে হবে যাতে কলা ফসলের খাদ্যের ঘাটতি না হয়।

মুড়ি ফসল

প্রথম ফসলের চেয়ে মুড়ি ফসলের ফলন বেশি। তাছাড়া মুড়ি ফসলের উৎপাদন খরচ কম এবং ফসল একমাস আগে পাওয়া যায়। তিন বছরের বেশি কোন মুড়ি ফসল রাখা ঠিক নয়। কারণ ফলন কমে যায় এবং রোগবালাইয়ের আক্রমণ বেশি হয়। ফল সংগ্রহের সময় প্রথম ফসলের কলাগাছটিকে মাটির প্রায় ২ হাত উপর কাটতে হয়। তারপর নির্বাচিত চারা ব্যতীত অন্য সব চারাসহ মাতৃগাছের গুড়ি বা মোথা তুলে ফেলে ঐ স্থান সার মিশানো মাটি দ্বারা ভরাট করে দিতে হয়। অন্যান্য পরিচর্যা সাধারণ কলা বাগানের মতই করতে হয়।

পোকামাকড় ব্যবস্থাপনা

কলার পাতা ও ফলের বিটল পোকা:

পূর্ণাঙ্গ বিটল কচি পাতা ও কচি কলার সবুজ অংশ চেঁচে খেয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাগ সৃষ্টি করে। কলা বড় হওয়ার সাথে সাথে আকারে বড় হয় এবং কালচে বাদামী রং ধারণ করে। কলার গায়ে বসন্ত দাগের মত দেখায় এবং এর বাজার মূল্য কমে যায়।

প্রতিকার:

- মোচা বের হওয়ার সাথে সাথে ছিদ্রযুক্ত পলিথিন বা মশারি দিয়ে কলার কাঁদি ব্যাগিং করে এ পাকার আক্রমণ থেকে কলাকে রক্ষা করা যায়।
- এ ক্ষেত্রে মোচা থেকে কলা বের হওয়ার আগেই কাঁদির চেয়ে বড় আকারের দু'মুখ খোলা ছিদ্রযুক্ত পলিথিন ব্যাগের এক মুখ দিয়ে মোচাকে আবৃত করে কাঁদির সাথে আলতোভাবে বেধে দিতে হয় এবং নীচের দিকের মুখ খোলাই থাকে। নীচের মুখ খোলা থাকলে মোচার উচ্ছিষ্ট অংশ সহজে নীচে পড়ে যেতে পার, কাঁদি সম্পূর্ণ বের হওয়ার এক মাস পর ইচ্ছা করলে পলিথিন খুলে ফেলা যায়। তখন কলার চামড়া শক্ত হয়ে যায় বিধায় বিটল পোকা কোন ক্ষতি করতে পারে না। এ প্রযুক্তি শীতকালে ব্যবহার করলে কলা আকারে বড় হয় এবং ফলন বৃদ্ধি পায়।

কলার পানামা রোগের লক্ষণ

রোগ ব্যবস্থাপনা

পানামা: পানামা কলার সবচেয়ে ক্ষতিকারক রোগ। এটা ফিউজেরিয়াম নামক ছত্রাক দ্বারা হয়ে থাকে এবং ছত্রাক মাটিতেই থাকে। প্রথমে আক্রান্ত গাছের নিচের পাতাগুলির কিনারা হলুদ বর্ণ ধারণ করে। তারপর আস্তে আস্তে মধ্য শিরার দিকে অগ্রসর হয় এবং গাঢ় বাদামী রং ধারণ করে। পরবর্তীতে উপরের পাতাগুলো হলুদ হতে শুরু করে। ব্যাপকভাবে আক্রান্ত পত্রফলক পত্রবৃন্ত ভেঙ্গে ঝুলে পড়ে।

প্রতিকার:

- রোগমুক্ত চারা রোপণ করতে হবে।
- রোগাক্রান্ত গাছ শিকড় ও চারাসহ তুলে জমি থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে।
- রোগ প্রতিরোধী জাতের চাষ করতে হবে।
- আক্রান্ত জমিতে ৩-৪ বছর কলার চাষ করা যাবে না।
- জমি থেকে পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা করতে হবে।
- তিন মাস পানি দ্বারা ডুবিয়ে রাখলে জমিকে রোগমুক্ত করা যায়।

সিগাটোকা: এ রোগের প্রথম লক্ষণ হল গাছের তৃতীয় অথবা চতুর্থ কচি পাতায় ছোট ছোট হলুদ দাগ পড়া। তারপর দাগগুলো আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পায় এবং বাদামী রং ধারণ করে। ব্যাপকভাবে আক্রান্ত পাতাকে পোড়া মনে হয়। এ রোগে আক্রান্ত গাছের ফলন ১০-১৫% কম হয়।

প্রতিকার

- রোগ প্রতিরোধী জাতের চাষ করতে হবে।
- আক্রান্ত পাতা বা পাতার অংশবিশেষ কেটে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- সঠিক দূরত্বে গাছ লাগানো যাতে বাগানের সব কলা গাছ ঠিকমত আলো-বাতাস পায়।
- গাছের পাতায় রোগের লক্ষণ দেখা দিলে স্কোর প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মিলি অথবা নোইন বা ব্যাভিষ্টিন প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম অথবা একোনাজল/ফলিকোর প্রতি লিটার পানিতে ০.১ মিলি মিশিয়ে ১৫-২০ দিন অন্তর ২-৩ বার স্প্রে করা যেতে।

বানচি টপ বা গুচ্ছ মাথা রোগ: এটি ভাইরাসজনিত রোগ। আক্রান্ত গাছের পাতা সরু, খাটো ও উপরের দিকে খাড়া থাকে। কচি পাতার কিনারা উপরের দিকে বাকানো ও সমতল হলুদ রংয়ের হয়। একটি পাতা বের হয়ে বৃদ্ধি পাওয়ার আগেই আর একটি পাতা বের হয় কিন্তু পত্রবৃন্ত যথাযথভাবে বৃদ্ধি পায় না। এমনিভাবে অনেকগুলো পাতা গুচ্ছাকারে দেখায়। গাছ ছোট ছোট অবস্থায় আক্রান্ত হয়ে মোচা কখনও হয় আবার কখনও হয় না। ফুল আসার আগে আক্রান্ত হলে গাছে মোচা বের হলেও স্বাভাবিক ফল হয় না। জাব পোকার মাধ্যমে এ রোগ ছড়ায়।

প্রতিকার:

- রোগমুক্ত চারা রোপণ করতে হবে।
- ভাইরাসের বাহক জাব পোকা দমনের জন্য ইমিডাক্লোপিড (এডমায়ার ২০০ এসএল) (প্রতি লিটার পানিতে ০.২৫ মিলি) অথবা রিপকর্ড (প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি) ১৫ দিন অন্তর গাছে স্প্রে করা যেতে পারে।
- আক্রান্ত গাছের গোড়া সাকারসহ উঠিয়ে কুচি কুচি করে কেটে শুকিয়ে পুঁড়িয়ে ফেলতে হবে।

কলা সংগ্রহ

ঋতু ভেদে রোপণের ১০-১৩ মাসের মধ্যে সাধারণত সব জাতের কলা পরিপক্ক হয়ে থাকে। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চাষের ক্ষেত্রে কলার গায়ের শিরাগুলো তিন-চতুর্থাংশ পুরো হলেই কাটতে হয়। তাছাড়াও কলার অগ্রভাগের পুষ্পাংশ শুকিয়ে গেলেই বুঝতে হবে কলা পুষ্ট হয়েছে। সাধারণত মোচার পর ফল পুষ্ট হতে ২.৫-৪ মাস সময় লাগে। কলা কাটার পর কাঁদি শক্ত জায়গায় বা মাটিতে রাখলে কলার গায়ে কালো দাগ পড়ে এবং কলা পাকার সময় দাগওয়ালা অংশ তাড়াতাড়ি পচে যায়।

এই প্রযুক্তি ব্যবহারে খরচ ও লাভের পরিমাণ

পাহাড়ি এলাকায় বারি কলা-৩ চাষ করলে অধিক ফলন পাওয়া যায় এবং এর ফলে পাহাড়ি চাষিরা অধিক লাভবান হন। বারি কলা-৩ চাষ পদ্ধতিতে খরচ হয় হেক্টর প্রতি ২,০৯,৫০০ টাকা। হেক্টর প্রতি উৎপাদিত ফসলের দাম ৪,২৬,৮৯০ টাকা। প্রতি হেক্টরে লাভ ২,১৭,৩৯০ টাকা। লাভ খরচের অনুপাত ২.০৪।

প্রধান গবেষক: ড. মোঃ আমিন, সাবেক মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, আরএআরএস, হাটহাজারী, বারি, চট্টগ্রাম।

১.২২ পাহাড়ি এলাকায় লাউ চাষের আধুনিক কলাকৌশল

লাউ বাংলাদেশের শীতকালীন সবজিগুলোর মধ্যে অন্যতম। এই জনপ্রিয় সবজির ফল ও পাতা উভয়ই সবজি হিসেবে সুস্বাদু ও পুষ্টিকর। বাংলাদেশের সব এলাকায় এর চাষ করা হয়। বাণিজ্যিক চাষের পাশাপাশি মানুষ বসতভিটায় লাউ গাছ লাগিয়ে থাকে। দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মত পার্বত্য অঞ্চলেও লাউয়ের চাষ হয়। লাউ প্রধানত শীত মৌসুমের সবজি হলেও এটি উচ্চ তাপ ও অতিবৃষ্টি সহ্য করতে পারে, ফলে সারা বছরই এর চাষ করা যায়। শীতকালে এ সবজির চাষাবাদ বেশি হলেও বর্তমানে দেশে গ্রীষ্মকালেও এর যথেষ্ট উৎপাদন হচ্ছে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) কর্তৃক উদ্ভাবিত বারি লাউ-৪ একটি উন্নত গ্রীষ্মকালীন লাউ জাত। পাহাড়ি এলাকায় বারি লাউ-৪ এর উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কেজিএফ এর অর্থায়নে পার্বত্য জেলায় এই লাউয়ের জাতের সম্প্রসারণ কার্মকান্ড পরিচালিত হয়।

বারি লাউ-৪ এর দর্শনীয় ফলন

উদ্ভাবিত/নির্বাচিত প্রযুক্তির বর্ণনা

জলবায়ু ও মাটি

অধিক শীত ও গরম নয় এমন আবহাওয়া লাউ চাষের জন্য উত্তম। লাউ চাষের অনুকুল তাপমাত্রা হলো দিনের বেলায় ২৫-২৮ ডিগ্রী সে. এবং রাতের বেলায় ১৮-২০ ডিগ্রী সে.। মেঘলা আবহাওয়ায় লাউয়ের ফলন কমে যায়। জৈব পদার্থ বেশী আছে এমন দোআঁশ বা এটেল দোআঁশ মাটি লাউ চাষের জন্য ভালো।

জমি তৈরি, বীজ বোন, চারা তৈরি

সেচ ও পানি সরানোর সুব্যবস্থা এবং প্রচুর সূর্যের আলো পায় এমন জমি নির্বাচন করতে হবে। শিকড় বৃদ্ধির জন্য জমি ও গর্ত উত্তমরুপে তৈরি করতে হবে। চাষের পর জমিতে বেড তৈরি করতে হবে, বেড ১৫-২০ সেমি. উঁচু, ২.৩ মিটার চওড়া এবং জমির অনুযায়ী লম্বা হবে। পরপর দু'টি বেডের মাঝে ৬০ সেমি. নালা রাখতে হবে। মাদার আকার হবে ৪৫X৪৫X৪০ সেমি.।

জমির কিনারা থেকে ৪০ সেমি. জায়গা বাদ দিয়ে মাদার কেন্দ্র ধরে ৪ হাত অন্তর অন্তর ১ সারি মাদা তৈরি করতে হবে। প্রতিটি মাদায় ২-৩ টি করে বীজ বপণ করতে হবে।

লাউয়ের মাচা

ভাদ্র থেকে কার্তিক পর্যন্ত বীজ বোনার উপযুক্ত সময়। তবে বীজ উৎপাদনের জন্য কার্তিক মাসের শেষের দিকে বীজ বপন করা উত্তম।

হেক্টরপ্রতি ২-৩ কেজি (শতাংশে ৮-১০ গ্রাম) বীজের প্রয়োজন হয়। লাউ চাষের জন্য চারা নার্সারীতে পলিব্যাগে উৎপাদন করে নিলে ভালো হয়। এজন্য আলো বাতাস স্বাভাবিক পায় এমন জায়গায় ২০-২৫ সেমি উঁচুতে বেড করে নিতে হবে। বীজ বপনের জন্য ৮X১০ সেমি. বা তার থেকে বড় আকারের পলিব্যাগ ব্যবহার করা যায়। প্রথমে অর্ধেক মাটি ও অর্ধেক গোবর মিশিয়ে মাটি তৈরি করতে হবে। বীজ গজানোর জন্য মাটি জো করে তা পলি ব্যাগে ভরতে হবে। অতঃপর প্রতি ব্যাগে ২টি করে বীজ বুনে তার আকারের দ্বিগুণ মাটির গভীরে বীজ পুঁতে দিতে হবে।

বীজতলায় চারার পরিচর্যা

নার্সারীতে চারার প্রয়োজনীয় পরিচর্যা করতে হবে। বেশি শীতে বীজ গজাতে সমস্যা হয়। এজন্য শীতকালে চারা উৎপাদনের ক্ষেত্রে বীজ গজানোর পূর্ব পর্যন্ত প্রতি রাতে প্লাষ্টিক দিয়ে বীজতলা ঢেকে রাখতে হবে এবং দিনে খোলা রাখতে হবে। প্রয়োজন অনুসারে চারায় পানি দিতে হবে। তবে সাবধানে থাকতে হবে, যাতে চারার গায়ে পানি না পড়ে। পলি ব্যাগে মাটির চটা বাঁধলে তা ভেঙ্গে দিতে হবে। লাউয়ের চারা গাছে রেড পামকিন বিটল নামক এক ধরণের লালচে পোকার অক্রমণ হয়। এটির জন্য দমন ব্যবস্থা নিতে হবে। চারার বয়স ১৬-১৭ দিন হলে তা মাঠে প্রস্তুত গর্তে লাগাতে হবে।

সার ও সেচ

বারি লাউ-৪ এর জন্য প্রতি হেক্টরে গোবর ১০টন, ইউরিয়া ১৫০ কেজি, টিএসপি ১৭৫ কেজি, এমওপি ১৫০ কেজি, জিপসাম ১০০ কেজি, জিংক ১২ কেজি, বোরন ১০ কেজি হারে সার প্রয়োগ করতে হবে। জমি তৈরির সময় গোবর, টিএসপি এবং এমওপি সারের অর্ধেক এবং বাকি সারের সম্পূর্ণ অংশ প্রয়োগ করতে হবে (ইউরিয়া বাদে)। বাকি অর্ধেক এমওপি এবং ইউরিয়া সারের সম্পূর্ণ অংশ চার কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। পাহাড়ি এলাকার জন্য ডিবলিং পদ্ধতিতে সার প্রয়োগ করতে হবে।

পাহাড়ি জমিতে বারি লাউ-৪ এর চমৎকার ফলন

শুকনা মৌসুমে ৭ দিন অন্তর অন্তর লাউয়ের জমিতে সেচ দিতে হবে। ফল ধরার সময় এবং যখন শাখা-প্রশাখার বিস্তার হয় তখন প্রতি সপ্তাহে ১ বার সেচ দিতে হবে। ফল পরিপক্ক হওয়ার সময় সেচের পরিমাণ কমিয়ে দিতে হবে। ফল সংগ্রহের তিন সপ্তাহ আগে সেচ প্রদান বন্ধ করতে হবে।

বালাই ব্যবস্থাপনা

আগাছা দমনের জন্য রোপণের ৩০ দিন পর একবার মাটিতে জাবড়া প্রয়োগ করতে হবে এবং তিন বার (রোপণের ৩০, ৬০ এবং ৯০ তম দিনে) হাতে অথবা নিড়ানির সাহায্যে আগাছা পরিষ্কার করতে হবে ।

পোকামাকড় ও রোগ দমন

- পোকার আক্রমণ থেকে ফসল রক্ষা করার জন্য সেভিন ২ গ্রাম/লিটার হারে প্রতি ১০ দিন পরপর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।
- মাছি পোকা দমনের জন্য সেক্স ফেরোমন ফাঁদ এবং বিষটোপ ফাঁদ ব্যবহার করতে হবে।
- মাইট দমনের জন্য ভার্টিমেক ২ মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে ১১০-১২ দিন অন্তর ২-৩ টি স্প্রে করা যেতে পারে।
- পরিষ্কার চাষাবাদের জন্য থিওভিট ৮০ডব্লিউপি ২ গ্রাম/লিটার হারে মিশিয়ে ১৫ দিন অন্তর ২-৩ টি স্প্রে করা যেতে পারে।
- এফিড দমনের জন্য ২ চা চামচ সাবান গুড়া ১০ লিটার পনির সাথে মিশিয়ে ৭ দিন পরপর শীত মৌসুমে অথবা মেলাথিয়ন গ্রুপের যে কোন কীটনাশক প্রতি লিটার পানিতে ১.৫ মিলি মিশিয়ে ৭ দিন অন্তর ১-২ টি স্প্রে করা যেতে পারে।

এই প্রযুক্তি ব্যবহারে খরচ ও লাভের পরিমাণ

বারি লাউ-৪ এর উৎপাদন উন্নত পদ্ধতিতে ৭৮-৮০ টন/হে. হতে পারে যেখানে কৃষকের সনাতন পদ্ধতিতে চাষাবাদে ফলন মাত্র ৫০-৫৫ টন/হে.। বারি লাউ-৪ উন্নত চাষ পদ্ধতিতে খরচ হয় হেক্টর প্রতি প্রায় ৩,৬৯,৪৫০ টাকা। হেক্টর প্রতি উৎপাদিত ফসলের দাম প্রায় ৮,০৯,২৪৭ টাকা। প্রতি হেক্টরে লাভ প্রায় ৪,৩৯,৭৯৭ টাকা। লাভ খরচের অনুপাত প্রায় ২.১৯।

প্রধান গবেষক: ড. মোঃ খলিলুর রহমান ভুঁইয়া, সাবেক মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, আরএআরএস, হাটহাজারী, বারি, চট্টগ্রাম, ই-মেইল: csohathazari@gmail.com, মোবাইল: ০১৫৫২-৪১০১৯৯

১.২৩ পাহাড়ি এলাকায় পানি কচু চাষ

পানি কচু একটি পুষ্টিকর সবজি যার যার কচি পাতা, ডগা ও মূল সবই খাওয়া যায়। বাংলাদেশের মাটি ও জলবায়ু পানি কচু চাষের অনুকূল হওয়ায় দেশের সর্বত্র পানি কচুর চাষ করা যায়। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত উন্নত পানি কচুর জাত বারি পানি কচু-২ চাষের কলাকৌশল পাহাড়ি এলাকার কৃষকদের মাঝে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কেজিএফ এর অর্থায়নে পার্বত্য জেলায় একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়।

পাহাড়ি ভূমিতে পানি কচুর চাষ

উদ্ভাবিত/নির্বাচিত প্রযুক্তির বর্ণনা

জলবায়ু ও মাটি

মাঝারি নিচু থেকে উঁচু জমি যেখানে বৃষ্টির পানি সহজেই ধরে রাখা যায় অথবা সাময়িকভাবে জমে থাকে এমন জমি পানি কচু চাষের জন্য উপযোগী, পলি দো-আঁশ ও এঁটেল মাটি পানি কচু চাষের জন্য উত্তম। বারি পানি কচু-২ ছাড়াও পার্বত্য অঞ্চলে কিছু স্থানীয় জাতের কচুর চাষ হয়।

পানি কচু রোপণ

এই সবজির চাষ বর্তমানে বাণিজ্যিকভাবে করা হচ্ছে। আগাম চাষ করলে অধিক লাভবান হওয়া যায়। আগাম ফসলের জন্য কার্তিক এবং নাবি ফসলের জন্য মধ্যম ফাল্গুন থেকে মধ্য বৈশাখ কচু রোপণের উত্তম সময়। কচুর গোড়া থেকে ছোট ছোট চারা উৎপন্ন হয়। রোগ-পোকা আক্রমণমুক্ত সতেজ চারা পানিকচু চাষের জন্য 'বীজ চারা' হিসাবে ব্যবহার করতে হবে। চারা কম বয়সের হতে হবে, সাকার বীজ চারা হিসেবে ব্যবহার করতে হবে, চারা রোপণের সময় উপরের ২/১ টি পাতা বাদ দিয়ে বাকি সব পাতা ও পুরানো শিকড় কেটে ফেলতে হবে। তারপর মাটি থকথকে কাদাময় করে তৈরির পর নির্ধারিত দূরত্বে ৫-৬ সেমি গভীর চারা রোপণ করতে হবে। সারি থেকে সারির দূরত্ব ৬০ সেমি. এবং চারা থেকে চারার দূরত্ব হতে ৪৫ সেমি. হবে।

সার ও সেচ প্রয়োগ

পানি কচু চাষের জন্য হেক্টরপ্রতি ১০ টন গোবর, ৩০০ কেজি ইউরিয়া, ১৫০ কেজি টিএসপি, ৩০০ কেজি এমওপি ও ১০০ কেজি জিপসাম সার প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া বাদে বাকি সমস্ত সার জমি তৈরির শেষ চাষে প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া সার ২-৩ কিস্তিতে দিতে হবে, ১ম কিস্তি রোপণের ২০-২৫ দিনের মধ্যেই প্রয়োগ করতে হবে। চারা লাগানোর সময় জমিতে বদ্ধ পানি থাকলে প্লাবন সেচ দিয়ে জমি কাদাময় করতে হবে। জমি শুকিয়ে যাওয়ার উপক্রম হলে ঘন ঘন সেচ এবং জমিতে আর্দ্রতা সংরক্ষণের জন্য মালচিং করতে হবে। পানি কচুর গোড়ায় সব সময় পানি ধরে রাখতে হবে এবং পানি মাঝে মাঝে নাড়াচাড়া করে দিতে হবে। চারা বাড়-বাড়তির জন্য মাঝে জমি থেকে পানি সরিয়ে দিতে হবে। আবার নির্দিষ্ট মাত্রায় পানি দিতে হবে।

বালাই ব্যবস্থাপনা

পানি কচুর জমি সব সময় আগাছামুক্ত রাখতে হবে। আগাছা দমনের জন্য চারা রোপণের ৬০ দিন পর্যন্ত গাছের গোড়ার মাটি খড় ও আগাছার লতাপাতা দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। কাণ্ডের গোড়ায় যে সকল চারা হবে সেগুলি তুলে ফেলতে হবে। চারা হিসেবে ব্যবহারের জন্য মাটির নিচের অংশ থেকে যেসব চারা আসবে তা থেকে ২/৩ টি চারা রেখে বাকি চারা কেটে দিতে হবে। লেদাপোকা, এফিড, লাল পিঁপড়া কচুর পাতা খেয়ে ফেলে। এসব পোকা দমনের জন্য এডমিয়ার ২০ এসএল প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মিলি এবং ওমাইট ৫৭ ইসি প্রতি লিটার পানিতে ১.৫ মিলি মিশিয়ে ১৪ দিন অন্তর অন্তর ৩ বার প্রয়োগ করা যেতে পারে। কচুর পাতায় বাদামী রঙের গোলাকার দাগ রোগ দমনের জন্য রিডোমিল্ড গ্লোড অথবা ডাইথেন এম ৪৫ প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে ১৪ দিন অন্তর অন্তর ৩ বার প্রয়োগ করা যেতে পারে।

পানি কচুর ক্ষেত

ফলন সংগ্রহ

চারা রোপণের ৪৫-৭৫ দিনের মধ্যেই কচুর লতি ১০-১৫ দিন পরপর তোলা যায়। চারা রোপণের ১৪০-১৮০ দিনের মধ্যে পানি কচু সংগ্রহ করা যায়।

এই প্রযুক্তি ব্যবহারে খরচ ও লাভের পরিমাণ

বারি পানি কচু-২ উচ্চ ফলনশীল, লতির ফলন ২০ টন/হে. ও কাণ্ডের ফলন ১৪ টন/হে. হতে পারে। বারি পানি কচু-২ চাষে খরচ হয় হেক্টর প্রতি ২,৬০,৩০৯ টাকা। হেক্টরপ্রতি উৎপাদিত ফসলের দাম ৫,০৪,০৭০ টাকা। প্রতি হেক্টরে লাভ ২,৪৩,৭৬১ টাকা। লাভ খরচের অনুপাত ১.৯৪।

প্রধান গবেষক: ড. মোঃ খলিলুর রহমান ভুঁইয়া, সাবেক মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, আরএআরএস, হাটহাজারী, বারি, চট্টগ্রাম, ই-মেইল: csohathazari@gmail.com মোবাইল: ০১৫৫২-৪১০১৯৯

১.২৪ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে আখ চাষ

পার্বত্য চট্টগ্রামে কৃষি উৎপাদনের নানা সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে দীর্ঘ গবেষণায় দেখা গেছে, এ অঞ্চলে আখ ও সাথী ফসলের আবাদ, ভেজালমুক্ত স্বাস্থ্যসম্মত গুড় উৎপাদন ও সংরক্ষণ এবং সাথী ফসল থেকে বিভিন্ন পণ্য উৎপাদন, ইত্যাদি কৃষি কর্মকান্ড ও উদ্যোগের মাধ্যমে দেশের পার্বত্য ভূমির উৎপাদনশীলতা বাড়ানো ও পার্বত্য অঞ্চলের জনগোষ্ঠির আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নতি ঘটানো সম্ভব। পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রচলিত তামাক চাষের চমৎকার লাভজনক বিকল্প হতে পারে আখ চাষ।

পার্বত্য চট্টগ্রামে চাষের উপযোগী আখের জাত

বাংলাদেশের সমতল এলাকায় আখে ফুল আসে না, কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি অঞ্চলে ফুল আসে। ফলে, এই অঞ্চলে উফশী ও অধিক চিনিযুক্ত নতুন আখ জাতের আবাদ করা যায়। কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে ব্যাপক পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে আখ, সাথী ফসল এবং গুড় উৎপাদন সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে বাংলাদেশ সুগারক্রপ রিসার্চ ইনস্টটিটিউট (বিএসআরআই)।

চিবিয়ে খাওয়া ও গুড় তৈরির জন্য উপযুক্ত আখের জাত

নিম্নলিখিত ৪টি চিবিয়ে খাওয়ার উপযোগী ৪টি আখের জাত পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে চাষাবাদের উপযোগী যথা, বিএসআরআই আখ ৪১, বিএসআরআই আখ ৪২। বিএসআরআই আখ ৪১ চিবিয়ে খাওয়ার জন্য একটি উত্তম জাত। এই জাতের বৈশিষ্ট্য হলো আখের ছাল সহজেই ছাড়ানো যায়, শাঁস নরম, রসালো এবং মিষ্টি। বিএসআরআই আখ-৪২ এর ফলন বেশি, তবে এই আখ শক্ত, সহজে ছাল ছাড়ানো যায় না বলে এটি কম জনপ্রিয়।

উপযুক্ত জাত নির্বাচন ও সঠিকভাবে চাষাবাদ করা হলে মুড়ি আখের চাষ অত্যন্ত লাভজনক। মুড়ি আখ চাষে পার্বত্য এলাকার জন্য উপযুক্ত জাতগুলো হচ্ছে: বিএসআরআই ৪১, বিএসআরআই আখ ৪২ ও ভিএম জি ৮৬-৫৫০।

গুড় তৈরির জন্য উপযুক্ত জাতগুলো হচ্ছে: ভি এম সি ৮৬-৫৫০, বিএসআরআই আখ ৪১, কিউ ৬৯ এবং রণাঙ্গন। বিএসআরআই আখ ৪১ এবং ভিএমসি ৮৬-৫৫০ সকল পার্বত্য জেলাতেই গুড় তৈরির জন্য উপযোগী।

আখ রোপণের উপযুক্ত সময় নির্বাচন

আক্ষের অধিক ফলনের জন্য উপযুক্ত সময়ে আক্ষ রোপন করা প্রয়োজন, যাতে আশানুরূপ চারা গজায়, কুশি জন্মায় এবং মাড়াইযোগ্য আক্ষ তৈরি হয়। অক্টোবর ও নভেম্বর (কার্তিক-অগ্রহায়ণ) মাস আখ রোপণের সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। তবে বৃষ্টির উপর নির্ভর করে এ সময়ের কিছুটা তারতম্য হতে পারে। অক্টোবর মাসে অতিরিক্ত বৃষ্টি হলে আখ রোপণ করা যাবে না, সেক্ষেত্রে নভেম্বর মাসে রোপণ করতে হবে।

আখের জন্য জমি চাষ ও সারিতে রোপণ

আখ একটি দীর্ঘ মেয়াদি ফসল। তাই আখ চাষের জন্য উত্তমরূপে জমি প্রস্তুত করা বিশেষ প্রয়োজন। জমি এমনভাবে প্রস্তুত করতে হবে যাতে পুরো বাড়ন্ত কাল জুড়ে এবং ফসল কাটার সময় পর্যন্ত মাটিতে শক্তভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। আখের জন্য অন্তত দু'বার জমি চাষ করতে হবে।

আখের এক সারি থেকে অন্য সারির দূরত্ব ১২০ সেমি. রাখা হলে সবচেয়ে বেশি ফলন পাওয়া যায়। এক সারি থেকে অন্য সারির দূরত্ব ১২০ সেমি. রাখা হলে দুই সারির মাঝখানে পর্যাপ্ত জায়গা থাকে যেখানে সাথী ফসল চাষের সুবিধা হয়।

সারের সঠিক মাত্রা

আখের উচ্চ ফলন এবং ভালো গুণাগুণের জন্য সঠিক মাত্রায় সার ব্যবহার করা প্রয়োজন। প্রয়োজনের তুলনায় কম বা মাত্রাতিরিক্ত সার ব্যবহার উভয়ই আখের জন্য ক্ষতিকর। আখ লম্বা সময় মাঠে থাকে বিধায় অন্যান্য ফসলের তুলনায় তার সারের চাহিদা বেশি। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে আখ চাষের জন্য বিএআরসির একটি সুপারিশ (আরএফডি-২০১২) রয়েছে, কিন্তু সঠিকভাবে চাষে যে উচ্চ ফলন আশা করা যায়, অর্থাৎ হেক্টরপ্রতি ১৪০-১৫০ টন, তার জন্য আরএফডি-২০১২ অনুযায়ী সার ব্যবহার যথেষ্ট নয়। উচ্চ ফলন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য বিএআরসির সুপারিশকৃত আরএফডি-২০১২তে বর্ণিত সারের মাত্রার চাইতে ১২৫% হারে বেশি সার ব্যবহার করতে হবে।

আখের সাথে উপযুক্ত সাথী ফসল নির্বাচন

আখের সঙ্গে সাথী ফসলের চাষ একটি আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি যা একক আখ চাষের তুলনায় অনেক বেশি লাভজনক। সাথী ফসল চাষ করে অধিক মুনাফা অর্জনের জন্য উপযুক্ত সাথী ফসল নির্বাচন করা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে আখের উপযুক্ত সাথী ফসল হতে পারে:

বান্দরবন: আলু/মূলা/বাঁধাকপি/ফরাশ শিম

রাঙ্গামাটি: মূলা/শিম/মিষ্টি আলু

খাগড়াছড়ি: ফরাশ শিম/বাঁধাকপি/গাজর/মূলা/টমেটো

আখ মাড়াই

এক সাথে বেশি আখ মাড়াই ও বেশী রস সংগ্রহের জন্য উন্নত মাড়াই কল ব্যবহার করা প্রয়োজন। বিএসআরআই-এর কৃষি প্রকৌশল বিভাগ ও বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন রেনউইক যজ্ঞেশর এন্ড কোং,

কুষ্টিয়া-এর যৌথ কারিগরী সহায়তায় **১৬** হর্স পাওয়ার ক্ষমতাসম্পন্ন বেল্ট বিহীন একটি মাড়াই কল উদ্ভাবন করা হয়। এই মাড়াই কলে রস নিষ্কাশন হয় ৬০-৬২%। পূর্বের মাড়াই কলে (**১৩** হর্স পাওয়ার মটর) রস নিষ্কাশন হতো ৪৫-৫০%। এই উন্নত মানের মাড়াই কল ব্যবহারের ফলে ছোবড়ার মাধ্যমে চিনির অপচয় হ্রাস পায় এবং গুড়ের পরিমাণ **১-১.৫%** বৃদ্ধি পায়।

গুড় উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ

বাংলাদেশে গুড় তৈরির প্রক্রিয়া অনুন্নত ও অস্বাস্থ্যকর। ব্যবসার জন্য গুড় উৎপাদনকারীগণ আখের রস পরিষ্কার করা এবং গুড়ের রং উজ্জ্বল করার জন্য **"হাইড্রোজ"** নামক একটি রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করে, যা বিষাক্ত এবং মানুষের শরীরের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে গুড় তৈরির জন্য কোন রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহৃত হয় না। আখের রস পরিষ্কার করার জন্য বন ঢেঁড়স ও উলট কম্বল গাছের ডালপালা ব্যবহার করা হয়। এই উদ্ভিতজাত দ্রব্য সম্পূর্ণ নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত। এই উৎপাদিত গুড় সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক, নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত। গুড় তৈরির সকল স্তরে পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করা হয়।

সনাতন পদ্ধতিতে সাধারণত মাটির পাত্রে (কোলা, হাঁড়ি ও চাড়ি) গুড় সংরক্ষণ ও বাজারজাত করা হয়। এভাবে সংরক্ষিত গুড়ের গুণগত মান দ্রুত হ্রাস পায়। যথাযথভাবে সংরক্ষণ না করলে বর্ষা মৌসুমে গুড় খাওয়ার অযোগ্য হয়ে পড়ে। ব্যাপক পরীক্ষা নিরীক্ষা করে গুড় সংরক্ষণের জন্য পলিব্যাগ এবং পেপার প্যাকেট উদ্ভাবন করা হয়েছে। উদ্ভাবিত পলিব্যাগের ধারণক্ষমতা **১** কেজি ও ৫০০ গ্রাম ও পেপার প্যাকেটের ধারণক্ষমতা **১** কেজি , ৫০০ গ্রাম ও ২৫০ গ্রাম। পলি ব্যাগ ও পেপার প্যাকেটে গুড়ের গুণগত মান অক্ষুন্ন রেখে **১০-১২** মাস সংরক্ষণ করা যায়। উল্লেখ্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের গুড় **পাহাড়ি আখের গুড়** নামে ব্রান্ডিং করা হয়েছে।

সাথী ফসলভিত্তিক পণ্য

আখের সঙ্গে সাথী ফসল হিসাবে বিভিন্ন ধরনের শীতকালীন সবজি, মশলা ও তেলবীজের চাষ করা যায়। এদের মধ্যে বেশ কতগুলো দ্রুত পচে যায়। উৎপাদন মৌসুমে চাহিদার তুলনায় সরবরাহ বেশি হওয়ায় কৃষক ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হয়। এই উচ্চ মূল্যের ফসল প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণের সুবিধা পার্বত্য অঞ্চলে নেই। তাই আলু, গাজর, টমেটো, চীনা বাদাম, রসুন ইত্যাদি থেকে বিভিন্ন ধরনের প্রক্রিয়াজত দ্রব্য তৈরি করা হয় এবং এগুলো তৈরির প্রক্রিয়া কৃষকদের প্রদর্শন করা যায়, যেমন, পটেটো চিপস/ওয়েফার, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই, টমেটো সস/কেচাপ, টমেটো পেস্ট, ক্যারোট হালুয়া, গারলিক সস, পিনাট বাটার, ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

প্রধান গবেষক: ড. আমজাদ হোসেন, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদী, পাবনা, মোবাইল: ০১৭১৮-৪২৬২০০

২. প্রাণিসম্পদ

২.১ ব্রয়লার মুরগির জাত বাউ-ব্রো চিকেন

বাংলাদেশের জনগণের জন্য টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে যথাযথ পুষ্টি নিরাপত্তা একান্ত প্রয়োজন। সম্প্রতি বাংলাদেশ খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করলেও দেশের আপামর জনসাধারণের জন্য পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনে আমরা অনেক পিছিয়ে আছি। পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনের জন্য প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার, যেমন-ডিম. দুধ ও মাংসের সরবরাহ বাড়ানো দরকার। হাঁস-মুরগি বা পোল্ট্রি দুনিয়া জুড়ে প্রোটিনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে স্বীকৃত। বিগত দুই দশক ধরে বাংলাদেশে প্রাণীজ প্রোটিনের চাহিদা পূরণে বাণিজ্যিকভাবে

বাউ ব্রো সাদা

বাউ ব্রো রঙিন

উৎপাদিত ব্রয়লার মুরগি মুখ্য ভূমিকা পালন করে আসছে, কিন্তু দেশের পোল্ট্রি শিল্প অনেকাংশে আমদানি নির্ভর। প্রতি বছর গ্র্যান্ডপ্যারেন্ট ও প্যারেন্ট বাচ্চা, খাদ্য উপকরণ, ঔষধপত্র ও আনুষাঙ্গিক যন্ত্রপাতি আমদানি করতে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করতে হচ্ছে। আমদানিকৃত মুরগিগুলো নূতন নূতন রোগ ব্যাধি নিয়ে আসছে যা পূর্বে আমাদের দেশে দেখা যেত না। এছাড়াও আমাদানিকৃত ব্রয়লার প্যারেন্ট ও গ্রান্ডপ্যারেন্টগুলো শীত প্রধান দেশের উপযোগী, বাংলাদেশের অবহাওয়ায় ঠিকভাবে খাপ খাওয়াতে পারে না। বিশেষ পরিবেশ ও উন্নত লালন পালন ব্যবস্থাপনা ছাড়া আমাদানীকৃত ব্রয়লার প্যারেন্ট/ গ্রান্ডপ্যারেন্ট মুরগিগুলো হতে কাঙ্খিত উৎপাদন পাওয়া যায় না। তাই প্যারেন্ট ও গ্র্যান্ডপারেন্ট স্টকের আমদানীনির্ভরতা কমানোর জন্য বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ-এর পোল্ট্রি বিজ্ঞান বিভাগ, এনএটিপি ও কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে দেশিয় জার্মপ্লাজম থেকে বাউ-ব্রো সাদা ও বাউ-ব্রো রঙিন নামে দুইটি ব্রয়লার জাত উদ্ভাবন করে।

উদ্ভাবিত প্রযুক্তির বর্ণনা

স্থানীয়ভাবে সংগৃহিত জার্মপ্লাজম ব্যবহার করে বাংলাদেশে প্রথম বারের মতো উন্নতমানের সুস্বাদু ব্রয়লার মুরগির জাত বাউ-ব্রো সাদা ও বাউ-ব্রো রঙিন উদ্ভাবন করা হয়েছে। উদ্ভাবিত জাত দু'টির উৎপাদন ক্ষমতা বিদেশ থেকে আমদানিকৃত মুরগির জাতগুলোর সমকক্ষ এবং মাংস খেতে সুস্বাদু। বাউ-ব্রো সাদা ও বাউ-ব্রো রঙিন স্ট্রেইনগুলো আরও উন্নত ও আবহাওয়া উপযোগী করার লক্ষ্যে খামারি পর্যায়ে পরিচিতির উদ্যোগ নেওয়া হয়।

বাউ-ব্রো সাদা ও বাউ-ব্রো রঙিন ব্রয়লারের উৎপাদন ক্ষমতা (৩৫ ও ৪২ দিন বয়সে)

বৈশিষ্ট্য	বাউ-ব্রো সাদা	বাউ-ব্রো রঙিন
১দিন বয়সের বাচ্চার ওজন (গ্রাম)	৩৯.০৯±০.২৮	৩৪.৪৭±০.৪৬
৫ সপ্তাহ বয়সে ওজন	১৪৮৩ ± ১৬.৩১	৯১৯±২৫.৯৪
খাদ্য রুপান্তর দক্ষতা (৫ সপ্তাহ পর্যন্ত)	১.৬১	১.৭০
৬ সপ্তাহ বয়সে ওজন (গ্রাম)	২০২৯ ± ৩০.০০	১২১০ ± ৩৪.৬৪
খাদ্য রুপান্তর দক্ষতা (৬ সপ্তাহ পর্যন্ত)	১.৬৮	১.৭৮
৬ সপ্তাহ পর্যন্ত মৃত্যুর হার (%)	০.৫-১.৮%	০.২৫-১.৫%
ড্রেসিং (%)	৭২.৩৫	৭৪.৪৫
পালকের রং	সাদা	রঙিন
চামড়ার রং	সাদা	হলুদাভাব
বাজারজাতকরণের আদর্শ বয়স	৩৫-৩৬ দিন	৪২-৪৫দিন
মাংসের ধরণ ও স্বাদ	আমদানীকৃত ব্রয়লারের চেয়ে শক্ত ও সুস্বাদু	শক্ত ও সুস্বাদু (দেশী মুরগির ন্যায়)

কৃষক পর্যায়ে এই প্রযুক্তির প্রয়োগ

উদ্ভাবিত জাতগুলো বাংলাদেশের আবহাওয়ার অত্যন্ত উপযোগী। মাংস খেতে সুস্বাদু, লালন-পালন সহজ এবং মৃত্যুহার খুবই কম। বাউ-ব্রো রঙিন মুরগি দেখতে দেশি মুরগির ন্যায় এবং এগুলোর বাজার মূল্যও প্রচলিত ব্রয়লারের চেয়ে

অনেক বেশি। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে খামারিদের মধ্যে এই জাতগুলো পালনের ব্যাপক আগ্রহ দেখা গেছে। বাউ ব্রো বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন ও বিভিন্ন অঞ্চলের খামারিদের কাছে তা পৌঁছানোর জন্য স্থানীয় বাণিজ্যিক হ্যাচারীতে প্যারেন্ট পালনের মাধ্যমে প্যারেন্ট বাচ্চা উৎপাদন করে তা কৃষক পর্যায়ে পৌঁছানোর ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। তাছাড়া, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে লাইন ও গ্র্যান্ড প্যারেন্ট পালন এবং তা থেকে বাচ্চা সরবরাহের উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছণীয়। প্রাথমিক পর্যায়ে বাচ্চার দাম কিছুটা কম রেখে খামারিদের মধ্যে সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে খামারিরা লাভবান হতে পারেন এবং দেখাদেখি আরও খামারি নতুন উদ্ভাবিত জাতগুলো পালনে উৎসাহী হন।

এই প্রযুক্তি ব্যবহারে খরচ ও লাভের পরিমাণ

প্রতি বছর ব্রয়লার প্যারেন্ট/গ্রান্ড প্যারেন্ট আমদানির জন্য প্রায় ১২০ কোটি টাকার বেশি খরচ হয়। উদ্ভাবিত জাতগুলো দিয়ে স্থানীয় সমস্ত চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হবে যা বিপুল পরিমান বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় করবে। সাধারণত ১০০০-১২০০ বাউ-ব্রো মুরগি পালনের জন্য প্রতি ব্যাচে ১,২০,০০০/- থেকে ১,৩০,০০০/- খরচ হয়। খরচ বাদ দিয়ে একজন খামারি এমন প্রতি ব্যাচ থেকে ২৫,০০০-৩০,০০০/- টাকা আয় করতে পারবেন এবং মুরগির বাচ্চার আমদানি কমাতে সহায়ত------
----

প্রধান গবেষক: প্রফেসর ড. মোঃ বজলুর রহমান মোল্লা, পোল্ট্রি বিজ্ঞান বিভাগ, বিএইড, ময়মনসিংহ, মোবাইল:০১৭১১-৩০৪১৭২, ই-মেইল:

রাণীক্ষেত রোগে আক্রান্ত কবুতর

২.২ বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে কবুতরের রোগ নির্ণয় ও তার চিকিৎসা

মানুষের পোষা প্রাণীর মধ্যে কবুতরই প্রথম প্রাণী। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ১ কোটি ৮০ লক্ষ কবুতর আছে যার ১১% বাণিজ্যিক খামারের আওতাভূক্ত। কবুতর পালনের জন্য খুব অল্প জায়গা লাগে, কম খরচে ঘর তৈরি করা যায়, খাদ্য খরচও খুব কম, কবুতর যে কোন আবহাওয়ায় টিকে থাকতে পারে এবং এদের রোগ-ব্যাধি কম হয়। তবে, হাঁস মুরগির তুলানায় কবুতরের রোগ কম হলেও কবুতর সাধারণত: প্যারাটাইফাইড, কলেরা, টিবি, পক্স, নিউক্যাসেল রোগ,রানীক্ষেত, ইনফ্লুয়েঞ্জা, ক্যাঙ্কার ইত্যাদি রোগ মারা যায়। বাংলাদেশে সম্প্রতি গড়ে উঠা কবুতর খামারে বিভিন্ন রোগের কারণে প্রচুর কবুতর মারা যাওয়ায় খামারিরা ব্যাপক ক্ষতির শিকার হন। কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে কবুতরের কি কি রোগ হয় তা নির্ণয়, চিকিৎসা পদ্ধতি এবং রোগ-ব্যাধি দমনের উপায় উন্নয়ন করা হয়েছে, যা এখানে বর্ণিত হয়েছে।

এই প্রযুক্তি ব্যবহারের উপায়

- কৃষককে/খামারিকে প্রশিক্ষণ রোগসমূহ ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে;
- কৃষক/খামারিকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের নারিকেলবাড়ীয়াস্থ কবুতর ক্লিনিকের সাথে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করে তাৎক্ষণিক কবুতরের রোগের লক্ষণের ছবি দিয়ে তথ্য আদান-প্রদান করে রোগ নির্ণয় ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসার পরামর্শ নিতে পারবে;
- কৃষক পর্যায়ে নিয়মিত কৃমির ঔষধ প্রয়োগ ও রাণীক্ষেতের লাইভ ও কিল্ড ভ্যাকক্সিন প্রয়োগের উদ্যোগ নিতে হবে।

পিজিয়ন পক্সে আক্রান্ত কবুতর

প্রযুক্তি ব্যবহারের সুবিধাদি

১. সহজে রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা প্রদানের মাধ্যমে কবুতরের মৃত্যুহার কমিয়ে খামারিগণ লোকসান এড়াতে পারেন যা আর্থিক ক্ষতির হার থেকে রক্ষা করবে।

২. ব্যাকটেরিয়া ঘটিত রোগের ক্ষেত্রে মিডিয়া কালচারের মাধ্যমে রোগ সনাক্তকরণে খামারিগণ অভ্যস্ত হতে পারেন

৩. ভাইরাস ঘটিত রোগ যেমন পক্স, প্যাপিলোমা ও রানীক্ষেত, ইত্যাদি রোগের লক্ষণসমূহ চিহ্নিত করে সে অনুযায়ী ব্যবহার গ্রহণ করা।

৪. নিচের ছক অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করে ভাইরাস ও কৃমিজনিত রোগসমূহের প্রকোপ হ্রাস করা সম্ভব হবে।

কবুতরের খামারে রোগ প্রতিরোধের জন্য ঔষধের ব্যবহার প্রণালী

রোগের নাম	ঔষধের নাম	প্রয়োগ পদ্ধতি এবং কত দিন পর পর ব্যবহার
কবুতরের রাণীক্ষেত রোগ	নবিলিস এনডি ক্লোন ৩০	এন.ডি লাইভ ভ্যাকসিন ডাইলুয়েন্টে গুলিয়ে ১ ফোঁটা করে চোখে বা নাকে দিতে হবে প্রতি ৪৫ দিন পর পর।
কবুতরের রাণীক্ষেত রোগ	ইমোপেস্ট	কিল্ড ভ্যাকসিন চামড়ার নীচে এবং/অথবা মাসপেশীর মধ্যে প্রতি কবুতরকে ০.৩ মিলি করে প্রতি ৪ মাস পর পর।
কবুতরের পক্স রোগ	পিজিয়ন পক্স	১ মাস বয়স হলে প্রতিটি কবুতরের ডানার নীচে সূঁচ ফুটিয়ে প্রয়োগ করতে হবে বছরে ১ বার।
কৃমিনাশক	এভিনেক্স/এভিপারভেট/ পাইপারভেট/পোলনেক্স	১ গ্রাম ৬-১০টি কবুতরকে সকালে পানি বা খাবারের সংগে প্রতি ৩ মাস পর পর খাওয়াতে হবে।
ভিটামিনের ঘাটতিজনিত	ভিটামিন বি-১+ বি-২ + বি-৬	১ গ্রাম ১লিটার পানিতে মিশিয়ে খাওয়াতে হবে মাসে ৫দিন।
ভিটামিন এডিই অভাবজনীত কারণে	ভিটা-এডিই/এসিভিট এডিই/রেনাসল	যে কোন এডিই ভিটামিন ১মিলি ২ লিটার পানিতে মিশিয়ে মাসে ২ বার রাতের বেলায় দিতে হবে।
ক্যালসিয়ামের অভাব	সানক্যালভেট-ডি/ ক্যালটেট-ডি	৬টি কবুতরের জন্য ১ বড়ি পানির সংগে গুলিয়ে মাসে ২ বার দিতে হবে।
জিঙ্কের অভাব	জিঙ্কভেট	১ মিলি/ ২ লিটার পানিতে খাওয়াতে হবে মাসে ২-৩ দিন।
উকুন ও মশা দমন	এরোসল	প্রতিদিন ১ বার এরোসল স্প্রে করতে হবে।
ডিহাইড্রেশন	স্যালাইন	তাপমাত্রা বা ধকল হলে ১ গ্রাম ২ লিটার পানিতে মিশিয়ে খাওয়াতে হবে।
সংক্রামক রোগ দমনে	কসুমিক্স প্লাস/সুলট্রিক্স	১ গ্রাম ২ লিটার পানিতে মিশিয়ে ১৫ দিন পর পর খাওয়াতে হবে
সংক্রামক রোগ দমনে	ভাইরোসিড	৪ মিলি/১ লিটার পানিতে মিশিয়ে সপ্তাহে ২ বার স্প্রে করতে হবে।

এই প্রযুক্তি ব্যবহারে খরচ ও লাভের পরিমাণ

দেশের উত্তরাঞ্চলে কবুতরের সবচেয়ে বেশি যে রোগ দেখা যায় তার মধ্যে রানীক্ষেত অন্যতম। রানীক্ষেত রোগের ১০০ মাত্রার একটি টিকার ভায়ালের সরকারি মূল্য মাত্র ২০ টাকা, অন্যদিকে বেসরকারি ৫০০ মাত্রার রানীক্ষেত রোগের লাইভ ভ্যাকসিনের মূল্য ২০০ টাকা এবং ৫০০ মাত্রার কিল্ড ভ্যাকসিনের মূল্য ৮০০-৯০০ টাকা যা প্রয়োগের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ টাকার (প্রতি জোড়া ফেন্সি কবুতরের বাজার মূল্য ৫০০০ থেকে ৩০,০০০ টাকা) কবুতরের প্রাণ বাঁচানো এবং লোকসান কাটিয়ে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হওয়া সম্ভব।

প্রধান গবেষক: প্রফেসর ড. মোঃ জালানউদ্দিন সরদার, ভ্যাটেনারী এবং প্রাণীবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, মোবাইল: ০১৫৫৬-৩০৮৫৬৪।

২.৩ গাভীর পুনঃপুন গর্ভধারণ ব্যর্থ হওয়া (রিপিট ব্রীডার সিনড্রোম)

রিপিট ব্রিডিং মানে হচ্ছে একটি গাভীর পুনঃপুন গরম হওয়া এবং এটি একটি সিন্ড্রোম বা কূলক্ষণ। রিপিট ব্রিডিং সিন্ড্রোমে আক্রান্ত একটি গাভীর বৈশিষ্ট্যসমূহ হচ্ছে- কমপক্ষে পরপর তিন বার গর্ভধারণ ব্যাহত হবে, নিয়মিত ভাবে গরম হবে, বয়স ১০ বছরের কম হবে, কমপক্ষে ১টি বাছুর দিয়েছে এবং দৃশ্যত প্রজননতন্ত্রে কোন রোগ নেই। গাভী পুনঃপুন গরম হওয়ার কারণে আর্থিক ক্ষতি হয় যেমন, একাধিক প্রজননের ব্যয়, দেরিতে বাচ্চা হওয়া, চিকিৎসা ব্যয়, ভাল জাতের গাভী ছাঁটাই। গাভীতে রিপিট ব্রিডিং সিন্ড্রোমে আক্রান্ত হওয়ার হার অত্যন্ত বেশি, বিভিন্ন এলাকায় এ সিন্ড্রোমে আক্রান্ত হওয়ার হার ২২.৩% পর্যন্ত দেখা গেছে। বাংলাদেশে সাধারণত গাভীর রিপিট ব্রিডিং সিন্ড্রোম প্রতিকারের জন্য উক্ত সিন্ড্রোমের সার্বিক কারণসমূহ পর্যালোচনা ছাড়াই অন্ধভাবে বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসা প্রদান করা হয়। উপরোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনায় নিয়ে, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ-এর বিজ্ঞানীগণ কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে বাংলাদেশের বিভিন্ন বাণিজ্যিক খামার ও গ্রামীণ পরিবেশে রিপিট ব্রিডার গাভীর বিভিন্ন ধরণের তথ্য সংগ্রহ ও গবেষণাগারে নানা পরীক্ষা-নীরিক্ষার মাধ্যমে রিপিট ব্রিডিং সিন্ড্রোমের কারণ অনুসন্ধান করেন এবং তার উপর ভিত্তি করে গাভীতে রিপিট ব্রিডিং সিন্ড্রোম প্রতিকারের জন্য ব্যবস্থাপনা ও চিকিৎসা পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন এবং রিপিট ব্রিডার গাভীর গর্ভধারণের হার বাড়ানোর চেষ্টা করেন।

উদ্ভাবিত প্রযুক্তির বর্ণনা

বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে রিপিট ব্রিডার গাভীর উপর দীর্ঘ তিন বছর গবেষণা করে নিম্নলিখিত প্রযুক্তিসমূহ উদ্ভাবন করা হয়েছে যার মাধ্যমে রিপিট ব্রিডার গাভীর গর্ভধারণের হার বাড়ানো যায়। নিম্নে প্রযুক্তিগুলো খামারি পর্যায়ে ব্যবহার পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হলো:

- ❑ **গাভীকে সুষম খাদ্য সরবরাহ করা**

বকনা, গর্ভবতী গরু, শুষ্ক গাভী বা দুগ্ধবতী গাভীর জন্য সুষম খাদ্য সরবরাহ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

খাদ্য	বিবরণ	পরিমাণ	দানাদার খাদ্যের সুষম মিশ্রণ	
আঁশ জাতীয় খাদ্য	কাঁচা ঘাস বা সাইলেজ ৬৬% (২/৩ অংশ); শুকনা ঘাস বা খড় ৩৪% (১/৩ অংশ)	২.৫ কেজি প্রতি ১০০ কেজি দৈহিক ওজনের বকনা বা গাভীর জন্য	খাদ্যের উপাদান	পরিমাণ
			ভুট্টা	২৫%
			গমের ভুষি	২০%
			চাউলের কুড়া	১৫%
			খেসারীর ভূষি	২০%
			সয়াবিন মিল	১৭%
			ডিসিপি	২%
			খাবার লবন	১%
			মোট	১০০%
দানাদার খাদ্য	৩ কেজি প্রতি বকনা বা গাভীর জন্য। তবে গর্ভবতী গাভীর জন্য দানাদার খাদ্যের মধ্যে প্রোটিন ও ক্যালসিয়াম-ফসফরাস সমৃদ্ধ খাদ্য বেশি দিতে হবে। দুগ্ধবর্তী গাভীর ক্ষেত্রে ৩ কেজি দানাদার খাদ্যের পাশাপাশি প্রতি ৩ লিটার দুধ উৎপাদনের জন্য ১ কেজি দানাদার খাদ্য অতিরিক্ত দিতে হবে।			
পানি	যথেষ্ট পরিমাণ			

গাভীর গরম হওয়া নির্ণয়ের জন্য বিভিন্ন প্রযুক্তি ব্যবহার করা ও পাল দেওয়ার উপযুক্ত সময় নির্ণয়

সার্থক প্রজননের জন্য প্রতিদিন নিয়মিত ও সঠিকভাবে বকনা বা গাভীর গরম হওয়া নির্ণয় করতে হবে। প্রতিদিন সকালে, দুপুরে এবং সন্ধার পর ২০-৩০মিনিট ভালোভাবে বকনা বা গাভীর আচরণ পর্যবেক্ষণ করলে ৯০% পর্যন্ত

উষ্ণতা নির্ণয় যন্ত্র

গাভীর গরম হওয়া নিশ্চিতভাবে নির্ণয় করা যায়। বাংলাদেশে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দুগ্ধবতী গাভী ঘরের ভিতর পালন করা হয় বিধায়, বাহ্যিকভাবে (লাফালাফি করা, চঞ্চলতা) গরম হওয়া বুঝা যায়না। সেক্ষেত্রে টিজার ষাঁড় ব্যবহারের মাধ্যমে গাভীর নীরব গরম হওয়া নির্ণয় করা যায়। অপারেশনের মাধ্যমে ষাঁড়ের শুক্রনালী কেটে অথবা প্রিপিউস স্থানান্তর করে টিজার ষাঁড় করা যায়। বর্তমানে উষ্ণতা নির্ণয় যন্ত্রের মাধ্যমে খামারিগণ এস্ট্রাসে থাকা গাভীর গরম হওয়া নির্ধারণ করতে পারেন। যখন গাভীর যোনীদ্বার ভেজা, ফুলা ও লাল থাকবে এবং যোনীমুখ দিয়ে নিঃসৃত স্বচ্ছ ঝিল্লি সুতার ন্যায় যোনীমুখ থেকে মাটি পর্যন্ত ঝুলতে দেখা যাবে তখন বকনা ও গাভীকে প্রজনন করাতে হবে, কারণ এই সময়ই হচ্ছে প্রজননের যথোপযুক্ত সময়।

❑ **প্রত্যেক প্রজননের জন্য গাভীকে দুইবার পাল দেওয়া**

গাভীর প্রজননের জন্য পাল দেওয়ার উপযুক্ত সময় নির্ণয় করার পর একজন খামারি যদি এই প্রযুক্তি ব্যবহার করেন তাহলে গাভীর গর্ভধারণের হার বাড়তে পারে।

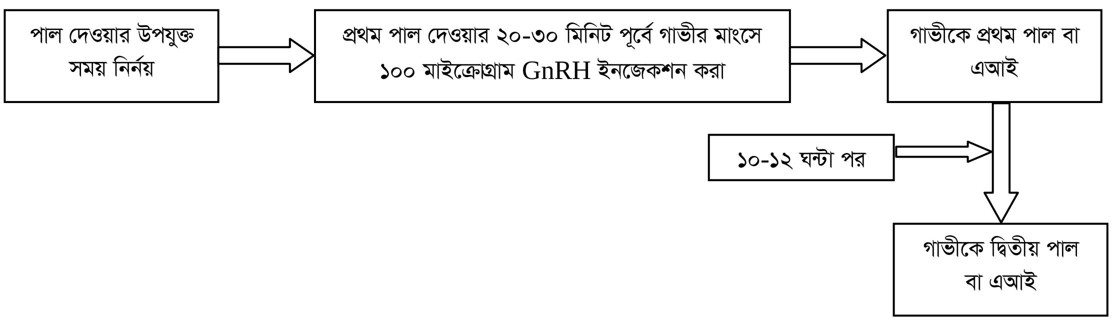

❑ **<u>এস্ট্রাস ইনডাকশন (কৃত্রিমভাবে এস্ট্রাস আনয়ন) প্রোটোকল ব্যবহার করে নির্দিষ্ট সময়ে কৃত্রিম প্রজনন</u>**

❑ **<u>গাভীর জরায়ুতে ভ্রুণ প্রতিস্থাপন</u>**

খামারি পর্যায়ে এই প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য একজন দক্ষ ভেটেরিনারিয়ানের তত্ত্বাবধানে একটি বিশেষ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। এক্ষেত্রে গাভীর জরায়ুতে ভ্রুণ প্রতিস্থাপনের জন্য বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগের সহযোগিতায় খামারিগণ খুব সহজেই তাঁদের রিপিট ব্রিডার গাভীর জরায়ুতে সুস্থ ও উন্নত জাতের ভ্রুণ প্রতিস্থাপন করতে পারবেন।

❑ **<u>গাভীর প্রজনন স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা</u>**

গাভীর প্রজনন স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার জন্য দুগ্ধবতী গাভীর প্রজনন স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা শীর্ষক ম্যানুয়াল, প্রজনন ঘড়ি ও ডিজিটাল অ্যাপ এবং দুগ্ধ খামার তথ্য সংরক্ষণ বই তৈরি করা হয়েছে এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে খামারিদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। এই ম্যানুয়াল, প্রজনন ঘড়ি ও ডিজিটাল অ্যাপ-এর মাধ্যমে খামারি তাঁর দুগ্ধ খামারের গাভীর প্রজনন স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা সর্ম্পকে সম্যক ধারণা পেতে পারেন, এতে করে তাঁর দুগ্ধ খামারের ব্যবস্থাপনা উন্নত হবে এবং গাভীর গর্ভধারণের হার বাড়বে। দুগ্ধ খামার তথ্য সংরক্ষণ বই ব্যবহারের মাধ্যমে খামারি তাঁর দুগ্ধ খামারের বিভিন্ন তথ্য যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে পারবেন।

উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ ব্যবহারের খরচ ও লাভ

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে দুগ্ধ খামারে একটি গাভীর রিপিট ব্রিডিং সমস্যা দেখা দিলে অনেক লোকসান হয়। যদি ধরে নেই একটি গাভীর ৫ মাস যাবত রিপিট ব্রিডিং হচ্ছে তাহলে তাঁর জীবন থেকে ৫ মাস ব্যহত হয়। এই সময় উক্ত গাভীকে খাওয়ানো বাবদ, অতিরিক্ত ৪-৫ বার প্রজনন করানো বাবদ, অতিরিক্ত চিকিৎসা বাবদ, খামারের শ্রমিক খরচ বাবদ অনেক অর্থের ব্যয় হয়। অন্যদিকে গাভীটির রিপিট ব্রিডিং সমস্যা দেখা দিলে উক্ত ৫ মাসে যে দুধ উৎপাদন হওয়ার কথা সেটাও ব্যহত হয়। এ থেকে বুঝা যায়, গাভীর রিপিট ব্রিডিং সিন্ড্রোম দুগ্ধ খামারের একটি প্রতিষ্ঠিত মারাত্মক অর্থনৈতিক ক্ষতির কারণ। এই পরিপ্রেক্ষিতে যদি আমরা উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ দুগ্ধ খামারের গাভীর বা বকনার প্রজননের জন্য ব্যবহার করি তাহলে- গাভী বা বকনার গর্ভধারণের হার বেড়ে যাবে যার মাধ্যমে রিপিট ব্রিডিং সিন্ড্রোম প্রতিরোধ করা যাবে। প্রযুক্তিসমূহ ব্যবহারের মাধ্যমে রিপিট ব্রিডিং সিন্ড্রোম প্রতিরোধ করা গেলে দুগ্ধ খামারী লাভবান হয়ে তাঁর আর্থসামাজিক উন্নতি হবে এবং বাংলাদেশে ক্রমবিকাশমান ডেইরী শিল্পের দ্রুত উন্নতি ঘটবে।

প্রধান গবেষক: প্রফেসর ড. নাসরিন সুলতানা জুয়েনা, সার্জারী এবং অবসটেট্রিক্স বিভাগ, ভ্যাটেনারী অনুষদ, বিএইড, ময়মনসিংহ, মোবাইল: ০১৭৫৯-৬৭৪২৬৭।

২.৪ ক্ষুদ্র ও মাঝারি লেয়ার খামারে জীবনিরাপত্তা পদ্ধতি

বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মুরগি পালন বাংলাদেশে একটি বিকাশমান শিল্প, যা কর্মসংস্থানে ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। বর্তমানে বাংলাদেশে মুরগির ১৬টি গ্রান্ডপ্যারেন্ট খামার ও দুই শতাধিক প্যারেন্ট খামার রয়েছে, যা থেকে প্রতি সপ্তাহে এক কোটি একদিন বয়সী মুরগির বাচ্চা উৎপাদিত হচ্ছে। দেশের ৬৫-৭০ হাজার বাণিজ্যিক লেয়ার খামার প্রতিদিন প্রায় ৩ কোটি ডিমের যোগান দিচ্ছে। বর্তমানে দেশে বাণিজ্যিক ব্রয়লার খামারসমূহ মাথাপিছু বার্ষিক ৬.৩ কেজি মাংসের যোগান দিচ্ছে, যা মোট মাংস সরবরাহের শতকরা ৪০ ভাগ।

বাংলাদেশে পোল্ট্রি শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় বিভিন্ন সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব, যা মোকাবিলার একটি কার্যকর উপায় হচ্ছে বায়োসিকিউরিটি বা জীবনিরাপত্তা পদ্ধতির চর্চা ও প্রসার। কিন্তু খামারিগণ এই জীবনিরাপত্তা পদ্ধতি ও তার সুফল সম্পর্কে তেমন অবহিত নন। বই-পুস্তকে জীবনিরাপত্তা সম্পর্কে বহু নির্দেশিকা থাকলেও তা নানা আর্থ-সামাজিক কারণে সব খামারির কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না। তাই, খামারিদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও মাঝারী লেয়ার খামারের উপযোগী ও বাস্তবসম্মত একটি জীবনিরাপত্তা পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ-এর রোগতত্ত্ব বিভাগ ও কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে।

লেয়ার খামারের জন্য "১০+১০" জীবনিরাপত্তা পদ্ধতি

উদ্ভাবিত প্রযুক্তির বর্ণনা

ক্ষুদ্র ও মাঝারি লেয়ার খামারের উপযোগী একটি জীবনিরাপত্তা পদ্ধতি হচ্ছে "১০+১০ জীবনিরাপত্তা" -------। এই পদ্ধতিতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি লেয়ার খামারের উপযোগী দশটি জীবনিরাপত্তা বিষয়ক বিধান ও দৈনন্দিন খামার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত দশটি কার্যক্রম অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে এছাড়া, জীবনিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্বলিত একটি আদর্শ লেয়ার খামারের ধারণাগত বিন্যাস দেখানো হয়েছে।

জীবনিরাপত্তা প্রযুক্তি একটি বিজ্ঞান নির্ভর সমন্বিত কার্যক্রম। খামার পর্যায়ে এই প্রযুক্তি যথাযথ প্রয়োগের জন্য খামারিদের প্রশিক্ষণ প্রয়োজন।

প্রযুক্তি ব্যবহারে খরচ ও লাভের পরিমাণ

অধিকাংশ জীব নিরাপত্তা কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য তেমন বাড়তি খরচ প্রয়োজন হয় না। তবে, কিছু অবকাঠামোগত জীবনিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্য এককালীন অর্থ বিনিয়োগের প্রয়োজন হয়। এক থেকে দুই হাজার লেয়ার মুরগির একটি ক্ষুদ্র খামারের জন্য আনুমানিক ২,৫০,০০০/- (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা) বিনিয়োগ করতে হতে পারে। জীবনিরাপত্তা ব্যবস্থার অর্থনৈতিক সুফল খামারিগণ দ্রুতই পেতে পারেন। জীবনিরাপত্তা সম্বলিত খামারে রোগের প্রার্দুভাব, জীব মৃত্যুহার এবং চিকিৎসা ব্যয় অনেক কমে যাবে, অপরদিকে উৎপাদন বাড়বে। ফলে, এক থেকে দুই বছরের মধ্যে জীবনিরাপত্তার জন্য বিনিয়োগকৃত অর্থ উঠে আসবে।

প্রধান গবেষক: প্রফেসর ড. মোঃ রফিকুল ইসলাম, প্যাথোলজি বিভাগ, ভ্যাটেনারী অনুষদ, বিএইড, ময়মনসিংহ, মোবাইল: ০১৭৫৯৬৭৪২৬৭

২.৫ প্রোবায়োটিক দ্বারা পশুখাদ্য হিসাবে ধানের খড়ের পুষ্টিমান বৃদ্ধি

ধানের খড় বাংলাদেশে গৃহপালিত জাবর-কাটা পশুর আঁশজাতীয় খাদ্যের প্রায় ৮৭%। কিন্তু খড়ে পুষ্টি উপাদান যেমন, প্রোটিন, শক্তি, খনিজ ও ভিটামিন কম থাকে। খড়ের পুষ্টিমান বৃদ্ধির জন্য বিগত কয়েক দশক ধরে বিজ্ঞানীগণ বিভিন্ন পদ্ধতি নিয়ে গবেষণা করে আসছেন তবে, এসব পদ্ধতির মধ্যে খুব কমই ধারাবাহিকভাবে সুফল দিতে পেরেছে, ফলে কৃষকগণ তা গ্রহণ করেননি। অধিকন্তু, রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করে খড়ের পুষ্টিমান বাড়ানো পশু স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ এবং অনিরাপদ। এসব কারণে প্রোবায়োয়টিকস (জীবন্ত অণুজীব) ব্যবহার করে খড়ে পুষ্টিমান বৃদ্ধির একটি বিকল্প পন্থা নিয়ে গবেষণা হয়েছে। প্রোবায়োটিকস ব্যবহার করে ধানের খড়ে প্রোটিনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং প্রাণিদেহে আঁশের পরিপাক বেড়ে যায়। এছাড়া, প্রোবায়োটিকস পাকস্থলীর অপকারী ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে প্রাণির স্বাস্থ্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। শুধু তাই নয়, এই নতুন পদ্ধতি প্রয়োগে গাভীর দুধ উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং দুধের গুণাগুণ সমুন্নত রাখে। বাংলাদেশে পশু খাদ্যে প্রোবায়োটিকস ব্যবহার এখনও সীমিত। দীর্ঘ গবেষণার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর-এর বিজ্ঞানীগণ ধানের খড়ে প্রাবায়োটিকস মিশিয়ে খড়ের পুষ্টিমান উন্নয়ন, গাভীর স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও দুধ উৎপাদন বাড়ানোর কৌশল ও পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন।

প্রোবায়োটিকস ব্যবহারের মাধ্যমে পশুখাদ্য হিসাবে ধানের খড়ের পুষ্টিমান উন্নয়নের পদ্ধতি

উদ্ভাবিত প্রযুক্তির বর্ণনা

প্রোবায়োটিকস ব্যবহার করে খড়ের মান উন্নয়ন ও গবাদিপশু উৎপাদনে এ প্রযুক্তিটি সহজ ও ব্যবহারযোগ্য। এর জন্য কাঙ্খিত প্রোবায়োটিকস বাজার থেকে ক্রয় করে সরাসরি ব্যবহার করা যাবে। প্রোবায়োটিক ব্যবহার করে খড়ের পুষ্টিমান বৃদ্ধি ও এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে পশুপালন লাভজনক হবে। এক্ষেত্রে কৃষকদের দলগতভাবে প্রযুক্তিটি হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দিতে হবে এবং এর গুরুত্ব বোঝাতে হবে। অন্যথায় পূর্বের প্রযুক্তিগুলোর মত এটিও কৃষকদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর (DLS), বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (BLRI) ও সংশ্লিষ্ট এনজিও-র মাধ্যমে কৃষকদের মাঝে প্রযুক্তিটি জনপ্রিয় করার উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

এই প্রযুক্তি ব্যবহারে খরচ ও লাভের পরিমাণ

খড় প্রক্রিয়াজাতকরণের রাসায়নিক পদ্ধতির চেয়ে এ পদ্ধতি অনেক কম খরচে সম্পন্ন করা যাবে। এটি নিরাপদ ও অন্যান্য পদ্ধতির অনুরূপ ঝুঁকিপূর্ণ হবে না। এ পদ্ধতিতে স্বাস্থ্যসম্মত গাভী পালন ও নিরাপদ দুধ উৎপাদন সম্ভব হবে ও বেশি দুধ উৎপাদনের ফলে কৃষক আর্থিক দিক দিয়ে লাভবান হবেন।

প্রধান গবেষক: প্রফেসর ড. আবু সাদেক মোঃ সেলিম, প্রাণীবিজ্ঞান ও পুষ্টি বিভাগ, বিএসএমআরএইড, সালনা, গাজীপুর, মোবাইল: ০১৭১৮-৩৭০৭২২

২.৬ উপকূলীয় লবণাক্ত জমিতে পশুখাদ্য হিসাবে 'পাকচোং' ঘাস উৎপাদন

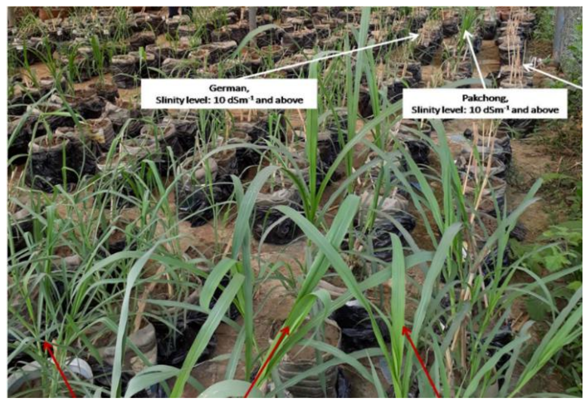

সবুজ ঘাস পশুদের জন্য অত্যন্ত সুস্বাদু এবং সহজে হজমযোগ্য খাবার। প্রাণিসম্পদ উৎপাদন বাড়ানোর জন্য সবুজ ঘাসের চাষাবাদে খরচ তুলনামূলকভাবে কম। সবুজ ঘাস কম সময়ে পশুর খাবারের উপযোগী হয়ে ওঠে এবং একবার বপন/রোপণ করলে কয়েক বছর যাবৎ তা থেকে ঘাস পওয়া যায়। সবুজ ঘাস দুধেল গাভীর জন্যও প্রয়োজনীয় পুষ্টি সরবরাহ করে এবং দুধ উৎপাদন বাড়ায়। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশের উপকূলীয় অঞ্চলে মাটিতে লবণাক্ততা ও অন্যান্য সমস্যার কারণে পশুখাদ্যে ঘাটতি বিদ্যমান যার কারণে প্রাণিসম্পদ উৎপাদন ব্যাহত হয়। এই সমস্যা সমাধানকল্পে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের এ্যাগ্রোটেকনোলজি ডিসিপ্লিন কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে লবণাক্ত জমিতে পশুখাদ্য হিসাবে বিভিন্ন জাতের ঘাস উৎপাদনের সম্ভাবনা বিষয়ে গবেষণার মাধ্যমে উপকূলীয় লবণাক্ত জমিতে আবাদযোগ্য লবণাক্ততা সহিষ্ণু ঘাসের জাত "পাকচোং" সনাক্ত করে ও লাগসই উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্‌ভাবন করে।

উদ্ভাবিত প্রযুক্তির বর্ণনা

ঘাসের বৈশিষ্ট্য

পাকচোং উষ্ণ মন্ডলীয় অঞ্চলের উচ্চ ফলনশীল ঘাসের মধ্যে অন্যতম। বাংলাদেশের বিদ্যমান আবহাওয়া পাকচোং ঘাস উৎপাদনের জন্য উপযুক্ত। গবাদিপশু এ ঘাসটি পছন্দ করে কারণ এটি নরম ও মিষ্টি স্বাদযুক্ত। এই ঘাস পাকচোং-১, নেপিয়ার পাকচোং-১ অথবা সুপার নেপিয়ার ঘাস হিসেবেও পরিচিত। এটি বহুবর্ষজীবি ঘাস। এই ঘাস অধিক কুশি উৎপাদনশীল, দ্রুত বর্ধনশীল, রোগবালাইমুক্ত, উচ্চ ফলনশীল, আমিষসমৃদ্ধ, সুস্বাদু ও দ্রুত হজম হয়। লবণাক্ত মাটিতে পাকচং ঘাসের উচ্চতা ২৬৫-২৮৬ সেমি এবং স্বাভাবিত মাটিতে (অলবণাক্ত) উচ্চতা ৩৩৫-৩৫০ সেমি। প্রতিটি গাছে ১৭-২০ টি পাতা থাকে লবণাক্ত মাটির ঘাসে এবং স্বাভাবিক মাটিতে পাতার সংখ্যা ১৮-২১ টি।

পাকচোং ঘাস পুষ্টিমান বিচারেও উৎকৃষ্ট। এই ঘাসটি নরম হওয়াতে গবাদিপশু খাদ্য হিসেবে সহজে গ্রহণ করে। এ ঘাসে গড়ে ৭০% এর উপরে জলীয় পদার্থ, ৪.৫% এরও বেশি প্রোটিন, ৩৩ % আঁশ ও ১.৫ % চর্বি থাকে, যা গবাদিপশুর দেহের পুষ্টি চাহিদা পূরণ করতে পারে। পাকচোং ঘাসটি লবণাক্ততা সহিষ্ণু, যা বাগেরহাট, সাতক্ষীরা ও খুলনা জেলার যথাক্রমে মংলা উপজেলা, তালা উপজেলা এবং দাকোপ উপজেলার প্রত্যন্ত এলাকায় লবণাক্ত জমিতে চাষের উপযোগী। এই ঘাসটি স্বাভাবিকভাবে কম লবণাক্ত মাটিতে ভালো ফলন দেয়, কিন্তু এটি সর্বোচ্চ ১৫ ডেসি সাইমেন/মিটার পর্যন্ত লবণক্ত মাটিতে ফলন দিতে পারে।

মাটি ও জমি তৈরি

পাকচোং ঘাস বিভিন্ন ধরণের মাটিতে চাষাবাদ করা যায়। উর্বর ও সুষ্ঠু পানি নিষ্কাশন হয় এমন জমিতে এ জাতের ঘাসের উৎপাদন ভাল হয়। অপেক্ষাকৃত উচু, হালকা দোআঁশ ও বেলে মাটি এ ঘাস চাষের জন্য উপযোগী। গভীর চাষ

দিয়ে জমি তৈরী করতে হবে, যাতে ঘাসের শিকড় মাটির গভীরে প্রবেশ করতে পারে। এতে ঘাসের খরা সহিষ্ণুতা বেড়ে যায়। জমি ঘাসের কাটিং রোপণের উপযুক্ত অবস্থায় আনতে ৩/৪টি চাষ দিতে হয়।

রোপণ ও পরিচর্যা

কাটিং রোপণের উপযুক্ত সময় হলো ফাল্গুন-চৈত্র মাস (মধ্য ফেব্রুয়ারী থেকে মধ্য এপ্রিল)। এছাড়া বৈশাখ-জৈষ্ঠ্য (মধ্য এপ্রিল থেকে মধ্য জুন) মাস পর্যন্ত কাটিং রোপণ করা যেতে পারে, তবে অতিরিক্ত বৃষ্টির সময় কাটিং রোপণ করা উচিত নয়। পাকচোং ঘাস আবাদের জন্য ৪ থেকে ৫ মাসের অধিক বয়স্ক সুস্থ সবল গাছ থেকে ২/৩ নোড রেখে কাটিং তৈরি করতে হবে। উল্লেখ্য যে, কাটিং তৈরির সময় ধারালে দা অথবা বটি দিয়ে কাটতে হবে যেন কাটিংয়ের প্রান্ত দু'টির কোনোটি থেঁতলে না যায়। কাটিং রোপণের পূর্বে ৩/৪ ইঞ্চি গভীর করে মাটির উঠিয়ে সারি (ফারো) তৈরি করতে হবে। সারি থেকে সারির দূরত্ব হবে ৬০ সেমি এবং কাটিং থেকে কাটিং দূরত্ব হবে ৩০ সেমি। কাটিংটি ৪৫ ডিগ্রী কোণ করে সামান্য মাটি সরিয়ে একটি নোড মাটির মধ্যে আলতো ভাবে পুঁতে মাটি হাত দিয়ে চেপে ভালভাবে বসিয়ে দিতে হবে। প্রতি একর জমিতে আনুমানিক ২২,০০০ কাটিং প্রয়োজন। কাটিং রোপনের সময় কাটিং এর চোখগুলো উপরের দিকে দিতে হবে যাতে ভালভাবে বাতাস এবং সূর্যালোক পেতে পারে।

Pakchongat best spacing (60cm×30cm) and best fertilizer (Urea=62.5, TSP=87.5 &MoP=37.5 Kgha[-1]) dose, Tala

ঘাসের সুষ্ঠু বৃদ্ধি ও অধিক ফলনের জন্য গাছে প্রয়োজন মাফিক সার প্রয়োগ অপরিহার্য। সারের মাত্রা গাছের বয়স এবং কাটিং উচ্চতার উপর নির্ভর করে। পাকচোং ঘাসে নিম্নোক্ত পরিমাণ সার প্রদান করলে ভালো ফলন পাওয়া যায়। জমি তৈরির প্রস্তুত সময় হেক্টর প্রতি ৫০০০-৬০০০ কেজি গোবর সার মাটিতে প্রয়োগ করে মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। এছাড়াও হেক্টর প্রতি ১২৫ কেজি ইউরিয়া, ৮৭.৫ কেজি টিএসপি এবং ৩৭.৫ কেজি এমওপি সার প্রয়োগ করলে ভাল ফলন পাওয়া যায়। ইউরিয়া সারের অর্ধেক এবং অন্যান্য সকল সার জমির শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করতে হয়। অবশিষ্ট ইউরিয়া সার কাটিং রোপনের ৩০-৩৫ দিনের পর উপরি প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া সার প্রয়োগের পূর্বে দুই সারির মাঝের মাটি আলগা করে দিলে ভাল ফল পাওয়া যায়। জমিতে যদি পর্যাপ্ত রস না থাকে তাহলে ইউরিয়া সার প্রয়োগের পরপরই জমিতে সেচ প্রয়োগ করতে হবে। প্রতিবার ঘাস কাটার পর হেক্টর প্রতি ৬৫ কেজি ইউরিয়া সার প্রয়োগ করলে পরবর্তী ফলন ভালো পাওয়া যায়।

সার	পরিমাণ (কেজি/হেক্টর)
ইউরিয়া	১২৫
টিএসপি	৮৭.৫
এমওপি	৩৭.৫

কাটিং রোপণের পরে হালকা সেচ দিতে হবে। বর্ষা মৌসুমে সেচের প্রয়োজন হয় না। মাটির আর্দ্রতার উপর নির্ভর করে প্রতি ১৫ দিন পর পর সেচ প্রদান করলে ভালো ফলন পাওয়া যায়। নালা পদ্ধতিতে সেচ প্রয়োগ করলে ভাল হয়। বর্ষা মৌসুমে অথবা সেচ প্রদানের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে জমিতে আতিরিক্ত পানি জমে না যায়।

এই ঘাসে রোগবালাই সাধারণত খুবই কম হয়ে থাকে। এ ঘাসের উল্লেখযোগ্য রোগবাইয়ের মধ্যে হেড স্মাট, নেপিয়ার স্টান্টিং ও স্লো-মোল্ড রোগ অন্যতম। রোগবালাই দমনের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে:

- ✓ পরিষ্কার এবং রোগবালাই মুক্ত সুস্থ কাটিং রোপণ করতে হবে;
- ✓ আক্রান্ত গাছ শিকড়সহ তুলে পুড়িয়ে ফেলতে হবে;
- ✓ সঠিকভাবে এবং সময়মত ঘাসের প্রয়োজনীয় আন্তঃপরিচর্যা করতে হবে;

ঘাস কর্তন ও ফলন

কাটিং রোপণের ৯০ দিন পর প্রথমবার ঘাস কাটা যেতে পারে। ঘাস কাটার সময় গোড়ার দিকে ২-৩ ইঞ্চি রেখে কাটতে হবে। উপযুক্ত পরিচর্যা করলে পরবর্তী সময়ে ৪৫ থেকে ৬০ দিন পর পর এ ঘাস কাটা যায়। মাটির লবণাক্ততা ভেদে দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলীয় অঞ্চলের বিভিন্ন এলাকায় ৬০ দিন বয়স্ক ঘাসের ফলন ৪০-৪৬, ৭৫ দিন বয়স্ক ঘাসের ফলন ৫০-৬২ এবং ৯০ দিন বয়স্ক ঘাসের ফলন ৫৭-৭৬ টন/হেক্টর পাওয়া গেছে।

প্রধান গবেষক: প্রফেসর ড. শফিকুল ইসলাম, এগ্রোটেকনোলজি ডিসিপ্লিন, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, মোবাইল: ০১৭১১-১৯০৭৯৮

৩. মৎস্য সম্পদ

৩.১ বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ছোট ছোট পুকুরে মাছের চাষ

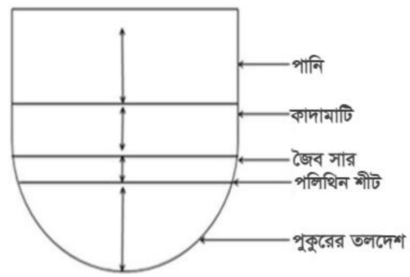

পুকুরের পানি ধারণ ক্ষমতা বাড়ানোর পদ্ধতি

বাংলাদেশের জলবায়ু মাছ চাষের জন্য বেশ উপযোগী এবং মাছ চাষের মাধ্যমে খুব তাড়াতাড়ি অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব। কিন্তু, বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের বরেন্দ্র এলাকায়, অর্থাৎ রাজশাহী, দিনাজপুর জেলার দক্ষিণাংশ, বগুড়া জেলার পশ্চিমাংশ, নাটোর, নওগাঁ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও অন্যান্য কিছু জেলায়, শুকনো আবহাওয়া ও কম বৃষ্টির দরুণ মাছের চাষ ব্যাহত হয়, মাছের উৎপাদন কম হয়। এই অঞ্চলে ছোট, বড় অনেক মৌসুমি পুকুর (যেসব পুকুরে বছরে ৫-৬ মাস পানি থাকে) পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। এসকল অঞ্চলের মাটিতে বালুর পরিমাণ বেশি থাকায় পুকুরের পানি ধরে রাখার ক্ষমতা কম। এছাড়া, মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ কম, লোহা ও এ্যালুমিনিয়ামের ভাগ বেশি, জলাশয়ের পানি অতিরিক্ত ঘোলা হয়ে থাকে। দীর্ঘ খরায় পুকুর শুকিয়ে অথবা অত্যধিক শীতে পানি শীতল হয়ে মাছের উৎপাদন ব্যাহত হয়। এখানকার মৌসুমি পুকুরগুলোতে গ্রীষ্মে পানি থাকে না বা পানি থাকলেও তা মাছ চাষের জন্য পর্যাপ্ত নয়। এজন্য এখানকার চাষিগণ মৌসুমি পুকুরগুলোতে মাছ চাষের আগ্রহ দেখান না বললেই চলে। তবে এই পরিত্যক্ত পুকুরগুলো কাজে লাগিয়ে মাছের উৎপাদন অনেকাংশেই বাড়ানো সম্ভব। এ বিষয়ে গবেষণার জন্য কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছিল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিশারীজ বিভাগ। প্রকল্পটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল ১) রাজশাহী অঞ্চলের মৌসুমি পুকুরগুলোর পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা, ২) মৌসুমি পুকুরের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য মাছের মিশ্র চাষের ক্ষেত্রে সঠিক প্রযুক্তি নির্ধারণ, এবং ৩) প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের চাষিদের মাছ চাষ প্রযুক্তি সম্পর্কিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি করা। গবেষণার জন্য আধা নিবিড় চাষ পদ্ধতিকে প্রাধান্য দিয়ে পবা, চারঘাট এবং বগুড়া সদর উপজেলার মোট ২৭টি পুকুরকে মাছের মিশ্র চাষের গবেষণার জন্য নির্ধারণ করা হয়।

প্রযুক্তির বর্ণনা

ড্রেজার দিয়ে পুকুর খুঁড়ে গভীরতা ৬-৮ ফুট করে নিতে হবে। পুকুরের আয়তন হবে ৬-১০ শতাংশের মধ্যে। পুকুরের পানি ধারণ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য ১) পুকুরের তলদেশে পলিথিন বিছিয়ে তার উপর আঠালো কাদামাটি ও জৈব সারের প্রলেপ দেয়া হয়, ২) পুকুরের তলদেশে শুধু কাদামাটি প্রয়োগ বা ৩) পুকুরের তলদেশে কম্পোস্ট প্রয়োগ করা হয়। তারপর পুকুরে সিলভার কার্প, রুই, মৃগেল, সরপুঁটি ও মনোসেক্স তিলাপিয়ার পোনা প্রতি শতাংশে ৬০টি হারে পোনা ছাড়া হয়। মাছ চাষের জন্য সার প্রয়োগ করা হয় ও মাছের উপযুক্ত পরিচর্যা করা হয়।

প্রযুক্তি ব্যবহারের সুফল

এই প্রযুক্তি পুকুরে লম্বা সময়ের জন্য পানি ধরে রাখতে সহায়তা করে ও পানির গভীরতা বাড়িয়ে মৌসুমি পুকুরগুলোকে সারা বছর পানি জমে থাকা মাছ চাষের উপযোগী জলাশয়ে পরিণত করে। দেখা গেছে, সাধারণ মৌসুমি পুকুরে যেখানে ৩ ফুটের মত পানি থাকে বছরে মাত্র ৫-৬ মাস, সেখানে তলদেশে প্রযুক্তি ব্যবহার করে সারা বছর পুকুরে ৫-৭ ফুট গভীর করে পানি ধরে রেখে বছর জুড়ে মাছের চাষ করা যায়। এই "মডেল" পুকুরগুলো থেকে ১৪.২৭-১৫.২১ কেজি/শতাংশ মাছ পাওয়া যায়, যেখানে সাধারণ মৌসুমি পুকুরে মাত্র ৫-৭ কেজি/শতাংশ পাওয়া যায়।

এই প্রযুক্তির সম্ভাব্য অবদান

- পুকুরের তলদেশে পলিথিন বিছিয়ে তার উপর কাদামাটির প্রলেপ দিয়ে পুকুরের পানি ধারণ ক্ষমতা বাড়ানো, এই প্রযুক্তি সবচেয়ে কার্যকর

- এই প্রযুক্তি দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের অসংখ্য মৌসুমি পুকুর যা শুকনো মৌসুমে মজে গিয়ে বিনা ব্যবহারে পড়ে থাকে সেগুলোকে সারা বছর মাছ চাষের উপযোগী করে তুলবে এবং কৃষকগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে সহায়তা করবে
- পরিত্যক্ত মৌসুমি পুকুরগুলোতে মাছ চাষের মাধ্যমে বেকারত্ব দূর করা সম্ভব তেমনি মাছ চাষের কিছু সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র সৃষ্টির মাধ্যমে বাংলাদেশের সামগ্রিক মাছ উৎপাদনের অবদান রাখা সম্ভব
- মৌসুমি পুকুরে মাছ চাষের সম্ভাবনা ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে কৃষকগণকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

প্রধান গবেষক: প্রফেসর ড. ইসতিয়াক হোসেন, মৎস্য বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ই-মেইল: bitanrubd@yahoo.com, মোবাইল: ০১৭২৬-৫১৪২৩২

কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন

এআইসি বিল্ডিং, বিএআরসি কমপ্লেক্স, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫, টেলিফোন: ৮৮-০২-৯১১১০৪১
ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৫৮১৫০২৭০, ই-মেইল: kgf-bd@live.com, ওয়েবসাইট: www.kgf.org.bd